কেরিয়ার গাইড : বন ব্যবস্থাপনা পাঠক্রম

প্রি-ওলিম্পিক হকিতে কি জিততে পারবে ভারত

৬ ডিসেম্বর ১৯৯৫ আনন্দবাজার প্রকাশন পনেরো টাকা

আনন্দমেলা

বি শে ষ আ ক র্ষ ণ

এই সংখ্যার সঙ্গে বিনামূল্যে

শচীন তেণ্ডুলকরের রঙিন মুখোশ

দু'সংখ্যায় সমাপ্য

সম্পূর্ণ রঙিন কমিক্স

অ্যাসটেরিক্সের নতুন অভিযান

অ্যাসটেরিক্স ও গথ দস্যু

(প্রথমাংশ)

Hajmola®
CANDY

Introducing two new flavours

Taste Naya! Jaise Jadoo Bhara!!

everest/d95/DIL/133 R

আনন্দমেলা

২১ বর্ষ ১৬ সংখ্যা ১৯ অগ্রহায়ণ ১৪০২ ৬ ডিসেম্বর ১৯৯৫

৩১ অ্যাসটেরিক্স ও গথ দস্যু (প্রথমাংশ)

গলদেশের এক ছোট্ট গ্রামে থাকে অ্যাসটেরিক্স আর ওবেলিক্স। বছরে একবার কারনুটের বনে হয় গলের পুরোহিতদের জমায়েত। প্রতিযোগিতায় যে পুরোহিত জেতেন, তিনিই হন সেই বছরের শ্রেষ্ঠ। পুরোহিত এটাসেটোমিক্স প্রতিযোগিতায় যোগ দিতে যাওয়ার জন্য পোঁটলাপুঁটলি বাঁধতে ব্যস্ত। কিন্তু কারনুটের বনে যাওয়ার পথ দীর্ঘ, পথে বিপদও অনেক। তাই অ্যাসটেরিক্স আর ওবেলিক্সও চলল সঙ্গে। প্রতিযোগিতায় এটাসেটোমিক্সই হলেন প্রথম। কিন্তু তারপর কী হল ? অ্যাসটেরিক্সের নতুন অভিযান 'অ্যাসটেরিক্স ও গথ দস্যু'র প্রথমাংশ প্রকাশিত হল এই সংখ্যায়।

শচীন তেণ্ডুলকরের রঙিন মুখোশ

প্রিয় খেলোয়াড় শচীন তেণ্ডুলকরের রঙিন মুখোশ এই সংখ্যায় বিনামূল্যে দেওয়া হল। শচীন তেণ্ডুলকরের অসংখ্য গুণগ্রাহীর মধ্যে আছে 'আনন্দমেলা'র বহু পাঠক-পাঠিকা। তাদের জন্যই বিশেষ উপহার এই মুখোশ।

আগামী আকর্ষণ

অ্যাসটেরিক্স ও গথ দস্যু (শেষাংশ)

অ্যাসটেরিক্সের রঙিন কমিক্স 'অ্যাসটেরিক্স ও গথ দস্যু'র শেষাংশ প্রকাশিত হবে আগামী সংখ্যায়। এর পাতায় পাতায় আছে অ্যাসটেরিক্স-ওবেলিক্সের রোমাঞ্চকর অভিযানের কাহিনী।

কুইজ, কমিক্স ও অন্যান্য নিয়মিত বিভাগ

এ ছা ড়া ও

ধা রা বা হি ক উ প ন্যা স

রাবণের মুখোশ বিমল কর ৭

হরিপুরের হরেক কাণ্ড শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায় ৭৫

গ ল্প

ফিরে এল লছা পিনাকীনন্দন চৌধুরী ২৪

রাজা পুলককুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ৫৬

কে রি য়া র গা ই ড

বন-ব্যবস্থাপনা পাঠক্রম অমর দাশ ১৬

আ জ কে র প্র যু ক্তি

কম্পিউটার জানিয়ে দেয়... অমিতাভ চৌধুরী ১২

বি শ্ব বি চি ত্রা

পরিত্যক্ত খনিতেও... ভাস্কর সেনগুপ্ত ২১

ক বি তা

সেই সে শহর ঈশিতা ভাদুড়ী ১০

খে লা ধু লো

সাড়া জাগিয়েও হারিয়ে যাচ্ছেন ... চন্দন রুদ্র ৫৯

খেলার খবর ৬১

প্রি-ওলিম্পিক হকিতে ... প্রতাপ জানা ৬৪

বিশ্বকাপে হিরওয়ানি ... তানাজি সেনগুপ্ত ৬৮

নি য়ি ত ক মি ক্স

আর্চি ১৫ টিনটিন ১৮ গন্তব্য নিউ ইয়র্ক ২২ গ্ল্যাডিয়েটর অ্যাসটেরিক্স ২৬ অরণ্যদেব ৩০ ডাঃ রেক্স মর্গান ৬২ টারজান ৬৬ গাবলু ৭০

নি য়ি ত বি ভা গ

চিঠিচাপাটি ৫ শব্দসন্ধান ৮ বিজ্ঞান : যেখানে যা হচ্ছে ৭২ হাসিখুশি ৭৬ কুইজ ৭৮ বইয়ের খবর ৮১ নানারকম ৮২

স ম্পা দ ক

দেবাশিস বন্দ্যোপাধ্যায়

আনন্দ বাজার পত্রিকা লিমিটেডের পক্ষে বিজিৎকুমার বসু কর্তৃক ৬ ও ৯ প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০০০১ থেকে মুদ্রিত ও প্রকাশিত। দাম ১৫ টাকা। বিমান মাশুল ত্রিপুরা ২০ পয়সা উত্তর-পূর্ব ভারত ৩০ পয়সা

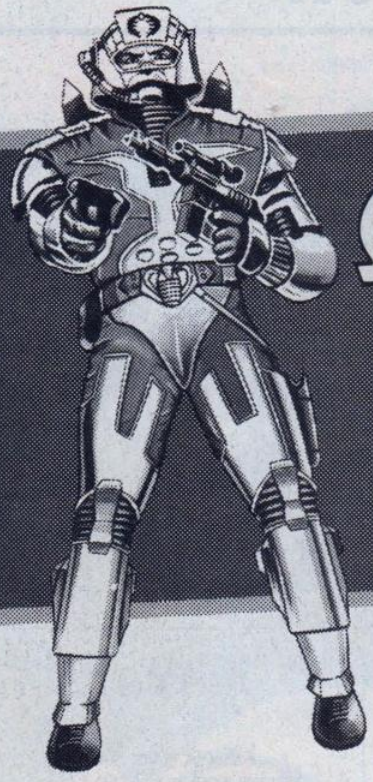

বিনামূল্যে!

একটি G.I.JOE

Rs. 42/- মূল্যের

প্রতি ৫০০ গ্রাঃ

হানি গোল্ড জারের সঙ্গে,

জি আই জো খেলনাগুলি বিখ্যাত আন্তর্জাতিক বীরপুরুষদের প্রতিকৃতি, যা প্রচার পরিকল্পনার অঙ্গ হিসাবে প্রতিটি ৫০০ গ্রাঃ হানি গোল্ড জারের সঙ্গে **"সম্পূর্ণ বিনামূল্যে"** পাওয়া যাবে।

এই সুযোগ কেবল মাত্র স্টক থাকা পর্যন্ত।

A Quality Product from Square D Biotech Limited (Home Products Division).

দৈনন্দিন জীবনে বিজ্ঞান

➤ দৈনন্দিন জীবনে নানা ছোটখাটো ব্যাপারে বিজ্ঞানের ভূমিকা অনস্বীকার্য। এবং বিজ্ঞানের এই বহুমুখী ভূমিকা নিয়ে লেখা 'ছোটখাটো ঘটনাতেও আছে বিজ্ঞান' রচনাটি পড়ে সত্যিই আনন্দ পেলাম। লেখক সন্তোষ মিত্র বেশ কিছু উদাহরণ দিয়ে বিজ্ঞানের নানা কর্মকাণ্ডের কথা সুন্দরভাবেই বর্ণনা করেছেন। প্রতিদিনের জীবনে আমরা জেনে বা না জেনে বিজ্ঞানের বিভিন্ন জটিল তত্ত্বের সাহায্য নিয়ে থাকি। লেখক লিখেছেন, কেউ যদি খুব আস্তে কথা বলে, তা হলে সাধারণত আমরা কানের পাশে হাতের পাতাটা অবতল করে ধরি। এ ব্যাপারটা হামেশাই ঘটে, তবে এই ব্যাপারটার সঙ্গে বিজ্ঞানের সম্পর্কটা খতিয়ে দেখি না। তেমন খতিয়ে দেখি না দূরের কাউকে ডাকতে হলে আমরা মুখের দু'পাশে দু'হাতের পাতা অবতল করে ধরি। এই ব্যাপারটির সঙ্গেও ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে আছে বিজ্ঞান। লেখক পরবর্তী পর্যায়ে এই ঘটনা দুটির পেছনে কী ধরনের বিজ্ঞান আছে, সেটাও উদাহরণসহ সুন্দরভাবে বুঝিয়েছেন। এমনকী 'পালোয়ানকে চ্যালেঞ্জ' শীর্ষক রচনাটিও অতি প্রাঞ্জলভাবে তিনি বুঝিয়ে দিতে পেরেছেন। আমাদের দৈনন্দিন জীবনের নানাকাণ্ডে বিজ্ঞানের ভূমিকা নিয়ে এই নিবন্ধটি প্রকাশের জন্য আনন্দমেলাকে জানাই আন্তরিক ধন্যবাদ।

অণিমা বসু
কলকাতা

রাগবি বিশ্বকাপ নিয়ে লেখাটি সুন্দর

'আনন্দমেলা' পত্রিকার খেলার লেখাগুলো আমার কাছে ভীষণ প্রিয়। এত খুঁটিনাটি বিশ্লেষণ থাকে বিভিন্ন খেলার যে, পড়ে অভিভূত হয়ে যেতে হয়। সেইসঙ্গে থাকে দারুণ-দারুণ ফোটো। বিশ্বকাপ ফুটবল নিয়ে প্রকাশিত সংখ্যাগুলি আজও আমার সংগ্রহে উজ্জ্বল হয়ে আছে। সেইসঙ্গে থাকে দারুণ-দারুণ খেলার পোস্টার। ২ অগস্ট ১৯৯৫ সংখ্যায় রাগবি বিশ্বকাপ নিয়ে তানাজি সেনগুপ্তের লেখাটি এরকমই একটি উল্লেখযোগ্য নিবন্ধ। রাগবি আমাদের দেশে তেমন জনপ্রিয় নয় বলেই, রাগবি বিশ্বকাপ নিয়ে তেমন হুল্লোড় চোখে পড়ে না। কিন্তু রাগবি বেশ জনপ্রিয় খেলা পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে। এবারে রাগবি বিশ্বকাপের ফাইনালে উঠেছিল নিউজিল্যান্ড ও দক্ষিণ আফ্রিকা। দক্ষিণ আফ্রিকাই জিতেছে ১৫-১২ গোলে। লেখাটি পড়ে মন ভরে গেল। বিভিন্ন খেলোয়াড়ের খেলার চমৎকার বিশ্লেষণও আছে লেখাটিতে। খেলার সঙ্গের ফোটোগুলিও দারুণ।

• **অমিতাভ সেন**
বাওয়ালি, ২৪ পরগনা

যোগাযোগ ব্যবস্থায় নতুন প্রযুক্তি

বিজ্ঞানের লেখাগুলি আমার কাছে বিশেষ সম্পদ। আনন্দমেলা পত্রিকায় এত সুন্দর-সুন্দর বিজ্ঞানের লেখা ছাপা হয় এবং বিজ্ঞান নিয়ে দারুণ সব প্রচ্ছদকাহিনী ছাপা হয় যে, পত্রিকার প্রতি ভালবাসা অনেক বেড়ে যায়। আনন্দমেলার বিজ্ঞান-বিষয়ক লেখাগুলি থেকে আমার পড়াশোনার বিষয়েও অনেক সাহায্য পাই। এরকমই একটি লেখা ভূপতি চক্রবর্তীর 'যোগাযোগ ব্যবস্থায় নতুন প্রযুক্তি ফ্যাক্স'। 'টেলেক্স' ও 'টেলিপ্রিন্টার'-এর তুলনায় অনেক দ্রুত লেখার প্রতিলিপি পাঠানো যায় এই নতুন প্রযুক্তির সাহায্যে। শুধু লেখার প্রতিলিপিই নয়, কোনও ছবি বা 'ড্রইং'-এর প্রতিলিপিও সরাসরি পাঠানো যায়। এখন তাই ফ্যাক্স আমাদের জীবনে ছড়িয়ে পড়েছে বিস্তৃতভাবে। কীভাবে ফ্যাক্স-এর সাহায্যে লেখা বা ছবির প্রতিলিপি পাঠানো হয় বা গ্রহণ করা হয়, সে-সম্পর্কেও বিস্তারিত জানতে পারলাম লেখাটি পড়ে। লেখাটিতে লেখক এত সহজভাবে প্রযুক্তির বিভিন্ন দিকের খুঁটিনাটি বর্ণনা করেছেন যে, পড়ে মুগ্ধ হতে হয়।

• **নিরুপমা দাশগুপ্ত**
কাঁকুড়গাছি, কলকাতা

দীর্ঘ দিন পরেও এর গুণ জলের মত পরিষ্কার
তাই খারাপ জিনিষ নিয়ে ঝামেলায় পড়বেন কেন?

টি-প্লাস বা তিন গুণ পুরু কোটিং যোগায় তৃপ্তি। এর জন্যই নন্-স্টিক বছরের পর বছর নন্-স্টিকই থাকে। বিদেশ থেকে আমদানী করা নন্-স্টিক সামগ্রী ভারতীয় রান্নার জন্যে বিশেষভাবে গড়ে নেওয়া হয়, এটি তাওয়ার ওপর শুকনো-তাপের ধকল বেশি ভাল সইতে পারে। সস্প্যান আর ফ্রাইপ্যানে এটি মশলা আর বেশী-তেলে ভাজার ধকলও সুন্দর সইতে পারে। যা-ই রাঁধুন না কেন - তৃপ্তির টি-প্লাস নন্-স্টিক থাকে বছরের পর বছর। তাই অন্য কিছু নেবার ঝুঁকি নিতে যাবেন কেন? যে-নন্-স্টিক অনেক বছর এগিয়ে আছে সেই তৃপ্তি টি-প্লাস সুবিধার ওপরই ভরসা রাখুন।

আমিও তৃপ্তির
টি-প্লাস-ই
নিয়েছি।

VENART/GA/BN

রান্নার নন্-স্টিক বাসন তৈরির ব্যাপারে ১৫ বছরেরও বেশি অভিজ্ঞতা।

বিনামূল্যে পুস্তিকার জন্য লিখুন

* ট্রেড মার্ক

তৃপ্তি আসল নন্-স্টিক রান্নার বাসন

তৃপ্তি সি-৪৩, রোড নং ২২, ওয়াগ্‌লে ইণ্ডাস্ট্রিয়াল এস্টেট, থানা-৪০০ ৬০৪।

রাবণের মুখোশ

বিমল কর

ছয়

মাধব সর্দার হুকুম মেনে কাজ করে।

রাজাবাবুর হুকুম-মতন সে পাঁচ বাউল বোষ্টম আর দুই ব্যাপারিকে কাছারিবাড়িতে এনে হাজির করল।

ততক্ষণে খানিকটা বেলা গড়িয়েছে। বড় কাছারিতে কাজকর্ম শুরু হয়ে গিয়েছিল। নায়েব, গোমস্তা, কর্মচারীরা যে যার মতন কাজ করছে। তাদের নজরে পড়ল, মাধব সর্দার আর তার এক শাগরেদ কয়েকজন লোককে নিয়ে এসে ছোট কাছারিতে জমিদারবাবুর কাছে পৌঁছে দিল।

ব্যাপারটা তারা ঠিক বুঝল না। তবে লোকগুলোকে দেখে মনে হল, এরা নতুন। মনসাচরের বাসিন্দে নয়। এরা কোথা থেকে এল, কেনই বা এল, মাধবই বা কেন এদের নিয়ে এসেছে, কিছুই বুঝতে না পেরে যে যার মতন অনুমান করে গালগল্প করতে লাগল।

রামজয় নিজের জায়গাটিতে বসে ছিলেন। হাত কয়েক তফাতে পাঞ্জালি। একপাশে একটা ফরাসও পাতা আছে। বয়স্ক লোকজন এলে রামজয় ওই ফরাসে তাঁদের বসতে বলেন। জমিদার হলেও রামজয়ের সৌজন্যবোধের অভাব নেই।

লোকগুলোকে রাজাবাবুর কাছে পৌঁছে দিয়ে মাধব বাইরে গিয়ে দাঁড়িয়ে রইল।

রামজয় তাকালেন। তাঁর সামনে দাঁড়িয়ে-থাকা বাউল বোষ্টমদের দিকেই তাঁর নজর গেল প্রথমে। পরে অন্য দু'জনকে দেখলেন। ভেতরে ভেতরে তিনি কী ভাবছেন, এদের সন্দেহ বা অবিশ্বাস করছেন কি না, তাঁর চোখমুখ দেখে তা ধরা যাচ্ছিল না।

"তোমরা কোত্থেকে আসছ?" রামজয় সাধারণভাবে জিজ্ঞেস করলেন প্রথম লোকটিকেই।

জমিদারবাবুকে আগেই তারা খাতির জানিয়ে নমস্কার সেরে নিয়েছিল, কিন্তু কোনও কথা বলেনি।

প্রথম লোকটিই এদের দলে বয়সে বড়। দেখতেও মোটামুটি ভাল। একটু গোলগাল নধর ধরনের চেহারা হলেও শক্তসমর্থ। সে বলল, "আমরা আমডোল থেকে আসছি।" বিনীতভাবেই বলল।

"তোমার নাম?"

"কৃষ্ণদাস।"

"কী করো সেখানে? আখড়া আছে?"

"আমাদের পুরনো মঠ আছে আমডোলে। রাধামাধবের সেবা হয়। আঠারো-বিশজন বৈষ্ণব থাকি।"

"এখানে আগে এসেছ?"

"একবার এসেছি। তিন বছর আগে। এবারে এসেছি মকরে স্নান করতে, শুদ্ধি হতে।"

"শুদ্ধি হতে? মানে?"

"আজ্ঞে, এবারের সংক্রান্তিতে তিনটি শুভ যোগ হয়েছে। আমরা শ্রীশ্রী মোহান্ত অধীরানন্দ জিউর ভক্তশিষ্য। এখানে মোহান্ত জিউর প্রধান শিষ্য শুভদাসজির অন্তিম হয়েছিল। তাঁর সমাধি আছে। সেখানে ক'দিন ভজন-পূজন করে ফিরে যাব।"

রামজয় রীতিমতন অবাক হলেন। তিনি ভাবতেই পারেননি, এমনভাবে গুছিয়ে কৃষ্ণদাস কথা বলতে পারে। শুভদাসের কথা রামজয় ছেলেবেলা থেকেই শুনেছেন। বড় সাধক। পরম বৈষ্ণব। তিনি একবার নাকি এখানে পৌষ সংক্রান্তিতে স্নান করতে এসেছিলেন। সে অনেক পুরনো কথা। কিন্তু শুভদাস তো এখানে দেহরক্ষা করেননি। অন্তত রামজয় তেমন কথা শোনেননি। অবশ্য শুভদাসের নামে নদীর কাছে একটা ভাঙা স্তূপ পড়ে আছে যে তা ঠিকই।

"তোমরা শুভদাসের শিষ্য?"

"না বাবু," কৃষ্ণদাস মাথা নাড়ল। বলল, "শ্রীশ্রী মোহান্তর শিষ্য ছিলেন প্রভু শুভদাস। আমরা তাঁর শিষ্যের শিষ্য।"

রামজয় অন্যজনের দিকে তাকালেন। "তোমার নাম?"

"প্রহ্লাদ।"

"তুমির এই দলে আছে? কত বয়েস তোমার?"

"বাইশ-চব্বিশ হবে। সঠিক জানি না, মহাশয়!"

মহাশয়! রামজয় যেন একটু হাসলেন। এই বয়েসেই গেরুয়া ধরেছে প্রহ্লাদ। মাথার চুল ছোট-ছোট। গাল তোবড়ানো। বাঁ গালে কাটা দাগ। শরীরের তুলনায় হাত দুটো ছোট।

একে-একে সকলের পরিচয় নিলেন রামজয়। তারপর কৃষ্ণদাসকে জিজ্ঞেস করলেন। "তোমরা এখানে মকর স্নান সারতে এসেছ! ভাল কথা। কিন্তু আসার আগে কিছু শোনোনি?"

কৃষ্ণদাস বলল, "না বাবু, আগে শুনিনি; এখানে এসে শুনলাম।"

"দশাননের কথা শুনলে! তোমাদের ভয় করছে না?"

কৃষ্ণদাস সরল মুখ করে হাসল। বলল, "আমাদের কিসের ভয় বলুন! আমরা গরিব ভিখিরি বাউল বোষ্টম, আমাদের আর কী আছে বলুন! একটা পুঁটলি আর একতারা, ক'টা খঞ্জনি। ডাকাত আমাদের কী নেবে?" বলে একটু চুপ করে থেকে আবার বলল, "শুনেছি, দশানন গরিব মানুষের ক্ষতি করে না।"

রামজয় শুনলেন। একবার তাকালেন পাঞ্জালির দিকে। মুখ ফিরিয়ে

শব্দসন্ধান

১	২		৩	■	৪		৫		৬
■		■	৭	৮		■		■	
৯	■	১০			■	■	১১		
	■		■	১২		১৩		■	■
১৪	১৫		১৬	■	■		■	১৭	১৮
১৯		■		■	■	২০	২১		
■	■	২২			২৩	■		■	
২৪			■	■	২৫	২৬		■	
	■		■	২৭			■		■
২৯					■	৩০			

সঙ্কেত : পাশাপাশি : (১) বাদশার রাজসভা। (৪) পরনির্ভর। (৭) এই পাখি জ্যোৎস্না পান করে বেঁচে থাকে বলে প্রবাদ। (১০) তাঁবুর পরদা। (১১) আষাঢ়ের ভারী মেঘ শরতে এইরকম হয়ে যায়। (১২) সৈন্য। (১৪) যে অক্ষম লোক মিথ্যা বড়াই করে। (১৭) ছাড়, বিয়োগ। (১৯) এরাই রামচন্দ্রকে লঙ্কার যুদ্ধে সহায়তা করেছিল। (২০) শনিবার আমরা যে-দিনের প্রতীক্ষায় থাকি। (২২) যে-ভূখন্ড ক্রমশ সরু হয়ে সাগরে মিশেছে। (২৪)— কাজেরই অঙ্গ একসঙ্গে গাঁথা। (২৫) বরের মাথার ভূষণ।(২৭) ব্যর্থ কর্মের গোড়ায় যা থাকে। (২৯) অস্থির মন যার। (৩০) যার আকৃতি সুন্দর নয়।

উপর-নীচ : (২) ক্রোধে যা গরম হয়ে টগবগ করে। (৩) এরই গুণে প্রবন্ধ সুন্দর হয়। (৪) এ কখনও আপন হয় না। (৫) ত্যাগ, বর্জন। (৬) দু'পাশে বৃক্ষশ্রেণীযুক্ত পথ। (৮) হত্যা। (৯) মধুচক্র। (১০) মাছ বা মাংসের সুস্বাদু ব্যঞ্জন। (১৩) মর্যাদা, সম্মান। (১৫) 'একই—পড় বারেবারে।' (১৬) যে-কাজ করে খুনের কিনারা করা হয়। (১৭) পিতা। (১৮) আধপাকা আধকাঁচা। (২১) যার জন্য লোকে আদালতে যায়। (২২) অকল্যাণ। (২৩)— চেরা চোখ ভাল। (২৪) প্রস্ফুটিত। (২৬) মেডেল। (২৭) ঈশ্বর অগতির—। (২৮) এই ধানে মই দিতে নেই।

গত সংখ্যার সমাধান

অ	ক্ষ	র	■	ম	ধু	■	নি	ঝু	ম
বা	য়	স	■	নো	লা	■	ম	০	ত
রি	■	না	চা	র	■	ভ	গ্ন	■	ল
ত	রী	■	■	থ	লি	য়া	■	ভা	ব
■	তি	ল	ক	■	চু	ন	■	গ্য	■
অ	■	■	ল	ব	■	ক	টা	হ	■
ব	ধ	■	ম	ন্দি	র	■	■	ত	প
ল	■	ক	চি	■	সা	স্ত্ব	না	■	লা
স্ব	■	ন্দ	■	জ	য়	■	ক	রা	ত
ন	ধ	র	■	টা	ন	■	চ	ম	ক

দেবসেনাপতি

নিলেন আবার। হঠাৎ তাঁর কী খেয়াল হল, বললেন, "কৃষ্ণদাস, ভুল শুনেছ ! দশানন নিজে কী করে জানি না, তবে তার চেলারা গরিবদের মায়াদয়া করে বলে শুনিনি। ...যাকগে, তুমি একটা পদ গান করো তো শুনি।"

রাজাবাবুর কথা শুনে পাঞ্জালি অবাক ! কৃষ্ণদাসকে গান গাইতে বলছেন ! কেন ? হঠাৎ তাঁর গান শোনার শখ হল কেন ?

কৃষ্ণদাসও প্রথমটায় হকচকিয়ে গিয়েছিল। সামলে নিল নিজেকে। তারপর বলল, "আজ্ঞে, তবে একটা বাউল গাই।" বলে সুর করে গাইল, "খ্যাপা ঘুমিয়ে রইলি ঘন্টা হল টিকিট কই নিলি। যখন পড়বে পাকা হবি ভ্যাকা ওরে বোকা তাই বলি....।"

রামজয় হাত তুলে থাকতে বললেন।

কৃষ্ণদাস চুপ করে গেল।

রামজয় বললেন, "ঠিক আছে, তোমরা যাও !....ভাল কথা, কাল সন্ধেবেলায় তোমাদের ওখানে কেউ হাঁক পেড়ে 'আয়- আয়- আয় রে' বলে ডাকছিল শুনেছ ? কানে গিয়েছে ?"

"আজ্ঞে হাঁ।"

"কে ডাকছিল ?"

"জানি না। একটা ডাক শুনেছি।"

"আচ্ছা যাও ! এবার ডাক শুনলে খেয়াল করবে— কে ডাকছে !" বলে রামজয় পাঞ্জালিকে বললেন, "বাইরে গিয়ে কাউকে বলো, ভেতরে গিয়ে খবর দিক, এদের সিধে দেওয়ার ব্যবস্থা করতে। আর অন্য দু' জনকে ডেকে দাও।"

কৃষ্ণদাসরা বিনীতভাবে নমস্কার জানিয়ে চলে গেল। পাঞ্জালিও বাইরে গেল।

এবার ঘরে এল দুই ব্যাপারি।

রামজয় দু' জনকেই খুঁটিয়ে দেখছিলেন। ব্যাপারিরা জমিদারবাবুকে প্রণাম জানাল ঘাড়-পিঠ নুইয়ে।

"তোমরা কোত্থেকে আসছ ?"

"মেহেরগঞ্জ থেকে হুজুর।"

"কী নাম তোমাদের ?"

"আজ্ঞে, আমার নাম নীলমণি রাইত, আর ওর নাম দক্ষিণা। আমরা সম্পর্কে কুটুম। ও আমার ছোট বোনাই।"

নীলমণির বয়েস চল্লিশের নীচে। পাকাপোক্ত শরীর। গায়ের রং শ্যামলা। মাথায় টেরিকাটা চুল। দাড়ি নেই, গোঁফ আছে। দক্ষিণার বয়েস বছর ত্রিশ-বত্রিশ। বেঁটেখাটো চেহারা। চোখ দুটো বড়-বড়, খানিকটা লালচে

রামজয় নীলমণিকেই বললেন, "তোমরা শুনলাম ব্যাপারি। কিসের ব্যবসা তোমাদের ?"

নীলমণি বলল, তার হল— তামাক, গুড়, ডাল আর মশলাপাতির ব্যবসা। সে সাধারণ ব্যাপারি, মহাজন নয়। আর দক্ষিণার ব্যবসা বলতে বাসনপত্রের। কলাই-করা থালা, বাটি, ঘটি, পেতলের পিলসুজ, প্রদীপ, সেও এমন বড় কিছু নয়। তবে জিনিসগুলো ভাল।

রামজয় বললেন, "মেলা বসতে-বসতে এখনও হপ্তাটাক বাকি। এত আগে-আগে এসে পড়লে ?"

নীলমণি বলল, "আমরা আগে এদিকে আর আসিনি বাবু ! মনসাচরের মেলার কথাই শুনেছি। বড় মেলা, জমকালো মেলা বসে জেনে এবার এলাম। ক'দিন আগে এলাম, ভালমতন জায়গা খুঁজে বসব বলে। দোকান পাতলে দু' পয়সা বিক্রিও হতে পারে মেলার আগে। আমরা সবেই এসেছি। মোটঘাট খুলিনি এখনও।"

রামজয় নীলমণিকে খুঁটিয়ে দেখছিলেন। লোকটা সত্যি কথা বলছে, না, চোখে ধুলো দেওয়ার চেষ্টা করছে ? এক বস্তা ডাল আর এক ধামা মশলাপাতি সাজিয়ে আনলেই কি ব্যাপারি হওয়া যায় !

দক্ষিণার সঙ্গে দু-একটা কথা বলতে গিয়ে রামজয় দেখলেন, লোকটা তোতলা। বেশ ভালমতনই তোতলা।

রামজয় নীলমণিকেই বললেন, "তোমরা এখানে আসার আগে রাবণের মুখোশ টাঙাবার কথা শোনোনি ?"

"না। এখানে এসে জানলাম।"

"তা এখন কী করবে ঠিক করেছ ?"

নীলমণি সামান্য চুপ করে থেকে বলল, "ভেবে পাচ্ছি না। চিন্তা হচ্ছে, বাবু। আবার ভাবছি, এসেছি যখন, তখন মেলা বসা পর্যন্ত দেখে যাই। লোকজন কেমন হয়, না দেখে ফিরে যেতেও মন উঠছে না। এখানে থাকলে আমাদের আলাদা আর কী হবে বলুন ! সকলের যা হবে আমাদের কপালেও তাই হবে।"

রামজয়ের ভালই লাগল কথাটা শুনতে। "তোমরা কি নৌকোয় এসেছ ?"

"আজ্ঞে।"

"আর ওই বোষ্টমের দল ?"

"ওরাও আমাদের নৌকোয় এসেছে।"

"একই জায়গা থেকে ?"

"না, আজ্ঞে। ওরাই আগে চেপেছিল, আমরা পরে।"

"নৌকোয় আর ক'জন আছে ?"

"দাঁড়ি মাঝি ছিল। নৌকো ফিরে যাওয়ার কথা।"

রামজয় বললেন, "গিয়েছে নাকি ? কাল পর্যন্ত তো ছিল।"

"জানি না আজ্ঞে।"

"ঠিক আছে। তোমরা যাও।....একটা কথা হে নীলমণি, যদি তোমরা মেলা পর্যন্ত না থাকো, ফিরে যাও, তবে কাছারিবাড়িতে এসে জানিয়ে যাবে।"

নীলমণিরা চলে গেল। পাঞ্জালি আগেই ফিরে এসেছিল। কথাবার্তা শুনছিল রাজাবাবুদের।

ঘর ফাঁকা হলে পাঞ্জালি রামজয়ের দিকে তাকিয়ে থাকল। বলল, "বোষ্টমদের কি খারাপ মনে হল, রাজাবাবু ?"

রামজয় অন্যমনস্ক ছিলেন। পরে খেয়াল হল। কেমন এক হাসি খেলে গেল চোখে। বললেন, "ভালমন্দ বুঝিনি এখনও। ওদের আমি আন্দাজ করতে দিতে চাই না, আমরা কৃষ্ণদাসদের সন্দেহ করছি।"

"সিধে দিতে বললেন যে—" পাঞ্জালি অবাক হয়ে বলল।

"হ্যাঁ, বললাম। ওরা যেন ধরে নেয় আমরা ওদের সন্দেহ করছি না।"

"ওই কেষ্টদাস বোষ্টমবাবাজির কথা শুনে....। আপনি আবার গান গাইতে বললেন।"

"বাজিয়ে দেখছিলাম হে ! যে বোষ্টম নয়, বাউল নয়, তাকে চট করে একটা গান গাইতে বললে ঘাবড়ে যাবে। গান মনে আসবে না।"

পাঞ্জালি মেনে নিল কথাটা। সে নিজেই তো কত গানের দু চার লাইন করে জানে, তা বলে কেউ যদি হুট করে গাইতে বলে তাকে, সে কি পারবে গাইতে ? বলল, "কেষ্টদাস কিন্তু গাইতে পারল বাবু !"

কবিতা

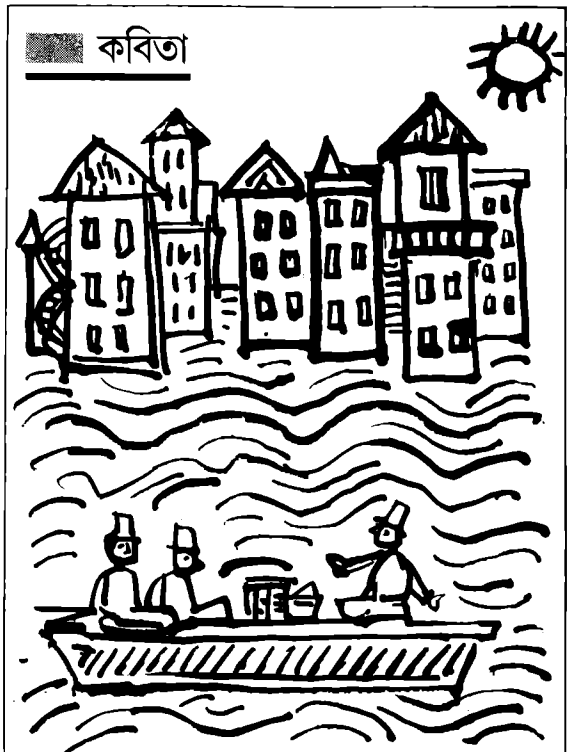

ছবি : কৃষ্ণেন্দু চাকী

সেই সে শহর

ঈশিতা ভাদুড়ী

সে-শহর আজ 'হাজার'—এই কথা বলে
সে-শহর ভাসে জলে
সোনা চকমকে হিরা
সেখানে টাকার নাম টাকা নয়, 'লিরা'

সেই সে-শহর মেতে থাকে অপেরায়
রাতদিন গান গায়
গণ্ডোলা...গন্‌ড়-ও-লা...
মানুষ এখনও সাদাসিধে প্রাণভোলা

তারা আঁকে সব টিনটরেটোর ছবি
সহজ ও সোজা সবই
উন্নত উঁচু নাসা
সেই সে-শহর জানে না অন্য ভাষা

তারা কারা জানো, ইতালি দেশের মানুষ
ওড়ায় আকাশে রং-বেরঙের ফানুস
'পিৎজা' খাদ্য যাহার
স্বপ্নের সেই ভেনিস শহর তাহার।

রামজয় স্বীকার করে নিলেন, কৃষ্ণদাস সত্যিই পেরেছে। তবে সচরাচর এমন গান মাঠঘাটের বাউলরা গায় না। ক্ষ্যাপা ঘন্টা হল ঘুমিয়ে থাকলি— টিকিট নিলি না— এমন একটা তত্ত্বের গান তারা ঝট করে গাইবে না। এদিকে রেলও নেই যে, গাড়ি দেখবে ঘন্টি শুনবে ! তত্ত্বের গান না গেয়ে বরং রাধাকৃষ্ণর গান বা হরি ভজনার গান গাইতে পারত !

"নীলমণিকে কেমন মনে হল, পাঞ্জালি ?" রামজয় বললেন।

"সাদামাটা। ওর কথায় লুকোচুরি আছে বলে মনে হয় না।"

রামজয় কোনও জবাব দিলেন না।

মাধব সর্দার এতক্ষণ বাইরে ছিল, দরজা দিয়ে মুখ বাড়াল।

"মধু ?"

মাধব ঘরে এল।

রামজয় বললেন, "কাছারি বাড়িতে যারা এসেছিল তাদের ওপর তুমি আগের মতনই নজর রাখার ব্যবস্থা করবে। তবে তোমার লোকজনকে বলবে সরাসরি যেন কিছু না বলে ওদের, না ঘাঁটায়। লুকিয়ে নজর রাখতে বলবে। পারলে ভাবসাব পাতাবে, কিন্তু কিছু বলবে না।... ভাল কথা, বদ্যিনাথের বেটার খবর পাওয়া গেছে।"

"না, হুজুর।"

"সে কি গাঁ-ছাড়া হয়ে গেল ?"

"এ-গাঁয়ে নেই।"

"ঠিক আছে, তুমি যাও।... আজ সন্ধেবেলায় ওই মৌনীবাবার চালার কাছাকাছি হাজির থাকবে। আমরা যাব। তুমি এখন যাও।"

মাধব সর্দার চলে গেল।

রামজয় উঠে পড়লেন। ঘরের মধ্যে পায়চারি করলেন বারকয়েক। খোলা জানলা দিয়ে বাইরে তাকালেন। বেলার রোদ এখন গাঢ়, রোদের রং দেখে মনে হচ্ছে, তাত জমেছে। কয়েকটা প্রজাপতি উড়ছিল। এক ঝাঁক চড়ুই। ঘাসের গায়ে-গায়ে গজিয়ে ওঠা বুনো ঝোপে ছোট-ছোট ফুল, বেগুনি রঙের।

রামজয় হঠাৎ বললেন, "পাঞ্জালি, তোমার সাধুবাবাকে না আসতে বলা হয়েছিল আজ।"

"আজ্ঞা, হাঁ।"

"সে এখনও এল না।"

"সময় আছে, বাবু।... হয়তো ঠিক খেয়াল করেনি কথাটা।"

"কাল যার গলা শুনেছিলে সে কিন্তু সাধুবাবা।"

"আমারও তেমন লাগে রাজাবাবু। আশেপাশে আর তো কারও থাকার কথা নয়। চোখেও পড়েনি।"

"কাকে ডাকছিল লোকটা।"

পাঞ্জালি জানে না। সে নিজেই অনেক ভেবেছে, বুঝতে পারেনি। বলল, "ওরা শ্মশান জাগেন, তন্তর মন্তর করেন, ভূত-পেয়েত কাকে ডাকেন কে জানে ! পাগলামি হতে পারে, বাবু !"

রামজয় কিছু বলতে যাচ্ছিলেন। বাইরে গোলমাল শুনে থেমে গেলেন। বড় কাছারি থেকে দিবাকর প্রায় ছুটতে-ছুটতে এসে বলল, "সেই খ্যাপাটে সাধুবাবা, শ্মশানের কাছে যে থাকে, বিরাট এক বুনো কুকুর নিয়ে জমিদার বাড়িতে ঢুকে পড়েছে। কুকরটা নেকড়ে বাঘের মতন দেখতে। কাছারির লোক ভয় পেয়ে গিয়েছে, হুজুর।"

পাঞ্জালির দিকে তাকালেন রামজয়। তারপর ইশারায় ডাকলেন তাকে। "চলো, দেখি।"

(ক্রমশ)

ছবি : সুব্রত চৌধুরী

অনুভবের
স্পর্শ
NIVEA
body
NIVEA
body
SKIN MILK
NIVEA
body
LOTION
GENTLE NOURISHING CARE
সারা বিশ্বে লক্ষ লক্ষ মানুষ জানেন যে তাঁদের সুন্দর ত্বকের গোপন কথা হ'ল নিভিয়ার স্নিগ্ধ পরশ। কারণ নিভিয়া জানে কিভাবে আপনার ত্বকের একান্ত যত্ন নিতে হয় - সর্বদা স্বাস্থ্যোজ্জ্বল ত্বকের আরো স্নিগ্ধ, আরো কোমল উপায় আপনার সামনে মেলে ধরে। এর মধ্যে অন্যতম একটি নিভিয়া বডি। সমস্ত ধরনের বৈশিষ্ট্যপূর্ণ ত্বকের জন্যে উপযুক্ত নানাবিধ লোশনের এক আন্তর্জাতিক মানের সম্ভার। যার মধ্যে একটি আপনারই জন্যে তৈরী।
আপনার অনুভব চায় শুধু যে স্পর্শ।
নিবেদন করছে জে. এল. মরিসন (ইং) লিঃ
JLM.95.AL.BN.

আজকের প্রযুক্তি

কম্পিউটার জানিয়ে দেয়

অনেক বইয়ের মলাটে, এমনকী অন্য জিনিসের গায়েও, ছাপা থাকে বারকোড। স্ক্যানার ও কম্পিউটারের সাহায্যে

বিদেশি পত্রপত্রিকা ও বইয়ের মলাটে, জিনিসপত্রের মোড়কে সাদার মধ্যে কালো-কালো দাগ ছাপানো দেখা যায়। অনেক সময় এই দাগগুলোর নীচে কয়েকটি সংখ্যাও ছাপা থাকে। এই দাগগুলোকে বলা হয় 'বারকোড'। এই বারকোড ছাড়া কোনও জিনিসপত্র বিক্রি বিদেশে খুবই কঠিন।

আমাদের দেশেও কয়েকটি কোম্পানি আজকাল এই পদ্ধতির ব্যবহার শুরু করেছে। এতে তাদের উৎপাদন ও বিক্রির হিসেব রাখা, বাজারে জিনিসটির কীরকম চাহিদা আছে, তার হিসেব রাখাও খুবই সহজ হয়ে গেছে। ইদানীং, বিভিন্ন লাইব্রেরির বইয়ের লেনদেনের হিসেব রাখতেও বারকোড পদ্ধতির ব্যবহার হচ্ছে। বারকোড হচ্ছে কয়েকটি 'বার' বা দাগের সমষ্টি। দুটো দাগের মধ্যবর্তী ফাঁকা জায়গাগুলো সংখ্যা বা সঙ্কেত বোঝাতে পারে, কোনও জিনিসকে সঠিকভাবে চিহ্নিত করার জন্য এর ব্যবহার চালু হয়েছে।

এই দাগগুলো নির্দিষ্ট মাপের হয়। বইয়ের মলাটে বা মোড়কে দাগগুলো ছাপতে হয় খুব সাবধানে। দাগগুলোর প্রস্থ যাতে নিঁখুতভাবে ছাপা হয়, সেজন্য বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করা দরকার। তা না হলে সঙ্কেতের অর্থ পালটে যেতে পারে। যেভাবে দাগগুলো দাগের মাঝখানের এবং ফাঁকা জায়গায় সাজানো হয়, তাকে বলা হয় 'সিম্বলজি'। ব্যবহার অনুযায়ী এই সিম্বলজি পালটানো হয়।

বারকোড যেভাবেই করা হোক না কেন, সেগুলোর পাঠোদ্ধার করা হয় একই পদ্ধতিতে। বারকোড লাগানো জিনিসটি যখন 'স্ক্যানার'-এর সামনে নিয়ে আসা হয়, তখন কয়েকটি 'লেন্স' এবং আয়নার সাহায্যে 'লেসার' রশ্মি বারকোডের ওপর পড়ে। এই লেসার রশ্মি কিন্তু মোটেই ক্ষতিকর নয়। সাদা অংশ থেকে রশ্মিটি প্রতিফলিত হয় কিন্তু কালো অংশ তা শোষণ করে নেয়। প্রতিফলিত রশ্মিটি একটি 'ইলেকট্রনিক ডিটেক্টর'-এ পাঠানো হয়। এই ডিটেক্টর রশ্মিকে 'ডিজিটাল' কোডে পরিবর্তিত করে এবং 'ডিকোডার'-এর সাহায্যে ডিজিটাল কোডগুলো কম্পিউটারের 'মেমরি' বা তথ্য ভাণ্ডারে চলে আসে। কম্পিউটার তখন জানতে পারে, একটি নির্দিষ্ট বস্তু 'স্টক' থেকে বেরিয়ে গেল। বস্তুটির বিশদ বিবরণ এবং দাম সঙ্গে

‘বারকোড’-এর সঙ্কেত

জানা যায় বারকোডের সাঙ্কেতিক অর্থ। লিখেছেন **অমিতাভ চৌধুরী**

সঙ্গে ‘ক্যাশ রেজিস্টার’-এ জানিয়ে দেয় কম্পিউটার। তখন ক্যাশ রেজিস্টার সেই তথ্য অনুযায়ী বিল ছাপিয়ে দিতে পারে।

স্ক্যানার তিনরকমের হয়। হাতে-ধরা স্ক্যানার বারকোডের সঙ্গে লাগিয়ে দাগগুলোর ওপর চালাতে হয়। লেসার স্ক্যানার ১০ সে.মি. থেকে ৫০ সে.মি. দূর থেকে বারকোড পড়তে পারে। ‘চার্জড কাপল্ড ডিভাইস (সি.সি.ডি) স্ক্যানার’ একগুচ্ছ ‘এল. ই. ডি’-এর সাহায্যে বারকোডকে আলোকিত করে। বারকোডের প্রতিচ্ছায়াকে ‘ফোটো ডিটেক্টর’-এ পাঠানো হয়। এই ডিটেক্টর এক বিশেষ প্রক্রিয়ায় দাগ এবং ফাঁকা জায়গার সঙ্কেতের পাঠোদ্ধার করে। ‘ই.এ.এন’, ‘ইউ.পি.সি,’ ‘কোড ৩৯’, ‘কোড ৪৯’, ‘কোড ১২৮’ প্রভৃতি অনেক বারকোড চালু আছে। তার মধ্যে ই.এ.এন (‘ইউরোপিয়ান আর্টিক্‌ল নাম্বার’) পদ্ধতিই সবচেয়ে জনপ্রিয়।

বিভিন্ন পত্রপত্রিকা ‘আই.এস.এস.এন’ (‘ইন্টারন্যাশনাল স্ট্যান্ডার্ড সিরিয়াল নাম্বারিং’) পদ্ধতি ব্যবহার করে থাকে। এতে বারকোডের নীচের সংখ্যাগুলো শুরু হয় ‘৯৭৭’ দিয়ে। পরের সাতটি সংখ্যা ওই পত্রিকার আই.এস.এস.এন নম্বর বোঝায়। ১১ এবং ১২ নম্বর সংখ্যা দুটি সাধারণত দাম বোঝায়। ১৩ নম্বর সংখ্যাটি ‘চেক ডিজিট’ হিসেবে ব্যবহৃত হয়। শেষের দুটি সংখ্যা পত্রিকাটি কোন মাসে ও কোন বছর প্রকাশিত, তা জানিয়ে দেয়। বইয়ের বারকোডের নীচের সংখ্যা শুরু হয় ‘৯৭৮’ দিয়ে।

এবার আসা যাক, পত্রপত্রিকা বা বই ছাড়া অন্য পণ্যের বারকোডের আলোচনায়। সাধারণত দৈনন্দিন ব্যবহার্য জিনিসের মোড়কে ই.এ.এন-১৩ পদ্ধতির বারকোডের চল বেশি। উৎপাদন কেন্দ্রের প্রয়োজন মেটাবার কাজে অবশ্য যে যার প্রয়োজনমতো বারকোড ব্যবহার করে থাকেন।

কোনও কারণে বারকোড যদি নোংরা হয়ে যায় বা ছিঁড়ে যায়, তখন স্ক্যানার বারকোড পড়তে পারে না। বারকোডের নীচে যে সংখ্যাগুলো থাকে সেগুলো তখন কাজে আসে। কোনও কর্মী ওই সংখ্যাগুলো ‘কি-বোর্ড’-এর সাহায্যে কম্পিউটারে পাঠালে, কম্পিউটার বাকি কাজগুলো করে নেয়।

স্ক্যানার যখন বারকোড পড়তে-পড়তে যায়, তখন কোথাও কোনও যন্ত্রটি যদি ভালভাবে পড়তে না পারে তা হলে ‘চেক ডিজিট’ কাজে আসে। সঠিকভাবে পড়তে পারলে ‘বিপ’ আওয়াজ বা সবুজ আলোর সঙ্কেতে তা জানিয়ে দেয় স্ক্যানার।

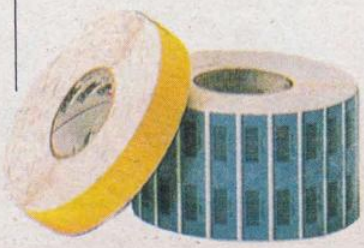

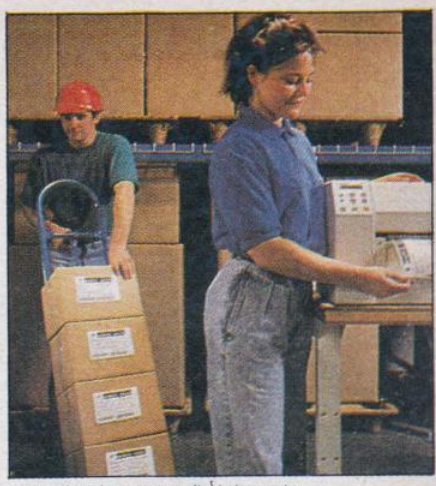

চলছে বারকোডের সঙ্কেত পাঠোদ্ধারের কাজ

আমরাও কিন্তু চেক ডিজিট পরীক্ষা করে দেখতে পারি। ধরা যাক কোনও একটি বইয়ের বারকোড 978 8172 15115 7 এখানে ‘চেক ডিজিট’ (৭) বাদ দিয়ে ১২টি সংখ্যা আছে। একেবারে ডান দিকের সংখ্যা থেকে অর্থাৎ ‘5’ থেকে শুরু করে একটি করে সংখ্যা বাদ দিয়ে দিয়ে বাঁ দিকে এগোতে হবে। এই সংখ্যাগুলোকে যোগ করে ‘3’ দিয়ে গুণ করে দাঁড়াচ্ছে 5+1+1+7+8+7= 29

29x3 = 87

এবার বাকি সংখ্যাগুলোকে যোগ করা যাক। 1+5+2+1+8+9=26 আগের গুণফলের সঙ্গে এই যোগফলের সমষ্টি হল 87+26= 113 একে 10 -এর গুণিতকে পূর্ণসংখ্যায় প্রকাশ করলে পাওয়া যাবে 120. এই সংখ্যার থেকে আগেকার যোগফলকে বাদ দিলে পাওয়া যাবে ‘চেক ডিজিট’ অর্থাৎ এক্ষেত্রে <120-113=7. কম্পিউটার এই হিসেবটি মুহূর্তের মধ্যেই সেরে ফেলে। হিসেবে না মিললে লালবাতির সঙ্কেতে জানিয়ে দেয়, কিছু গরমিল হয়েছে। তখন আর একবার স্ক্যানিং করাতে হয়। যদিও আমাদের দেশে বারকোড পদ্ধতি চালু হয়েছে, তবুও বেশিরভাগ প্রতিষ্ঠান তাদের নিজেদের কাজকর্ম তদারকের কাজেই এর ব্যবহার সীমাবদ্ধ রেখেছে। যাঁরা আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে অংশ নেবেন, তাঁরা বারকোড পদ্ধতির ব্যবহার এড়াতে পারবেন না। উৎপাদন ও বিক্রির নিখুঁত হিসেব রাখা ছাড়াও প্রতিষ্ঠানের উৎপাদন ও পরিষেবার ক্ষেত্রে দক্ষতাও এই পদ্ধতির সাহায্যে বাড়ানো সম্ভব।

ফোটো : ‘উইপ্রো ইনফোটেক লিমিটেড’-এর সৌজন্যে

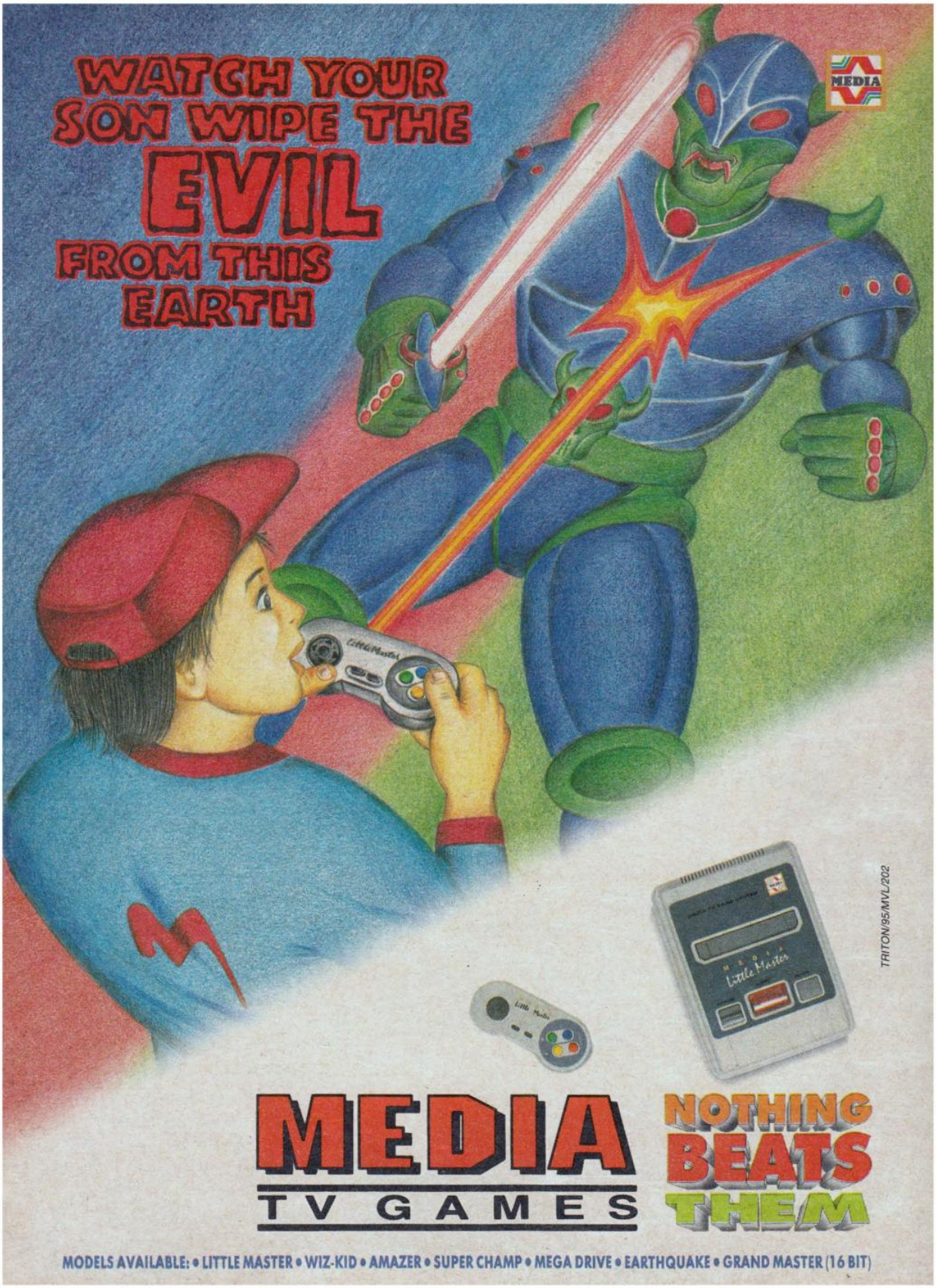

WATCH YOUR SON WIPE THE EVIL FROM THIS EARTH
MEDIA
Little Master
TRITON/95/MVL/202
MEDIA
TV GAMES
NOTHING BEATS THEM
MODELS AVAILABLE: • LITTLE MASTER • WIZ-KID • AMAZER • SUPER CHAMP • MEGA DRIVE • EARTHQUAKE • GRAND MASTER (16 BIT)

আর্চি

দু'জনের স্কেটিং -এর স্মৃতি সারাজীবনের মতো রাখতে চাই !
এ তো আমি আগেই ভেবেছি ।

বসলেই কথাটা মনে পড়ে । কী করতে হবে, জানি

আর্চি ও আমি, এই মুহূর্তের স্মৃতি ধরে রাখতে চাই ফোটো তুলবে ?
আমার ক্যামেরা নেই ।
ফোটো তোলো

এটা শস্তা । ফেলে দেওয়ার জিনিস ।
ফালতু ?
ভেতরে ফিল্ম আছে একবার তোলার পরই আর কাজে লাগে না ।

ঠিক আছে । স্কেট করো ।
দারুণ লাগছে, বেটি !
ধন্যবাদ !

বাঃ ! তোমরা পেশাদারদের মতো স্কেট করছ !

চমৎকার ! এটাই তোমার সেরা স্পিন
ক্লিক
ক্লিক

আর্চি, নিজেকেও টপকে গেলে !
ক্লিক
ক্লিক

হয়ে গেছে !
ধন্যবাদ মুজ !

ঠক
বাজে জিনিস

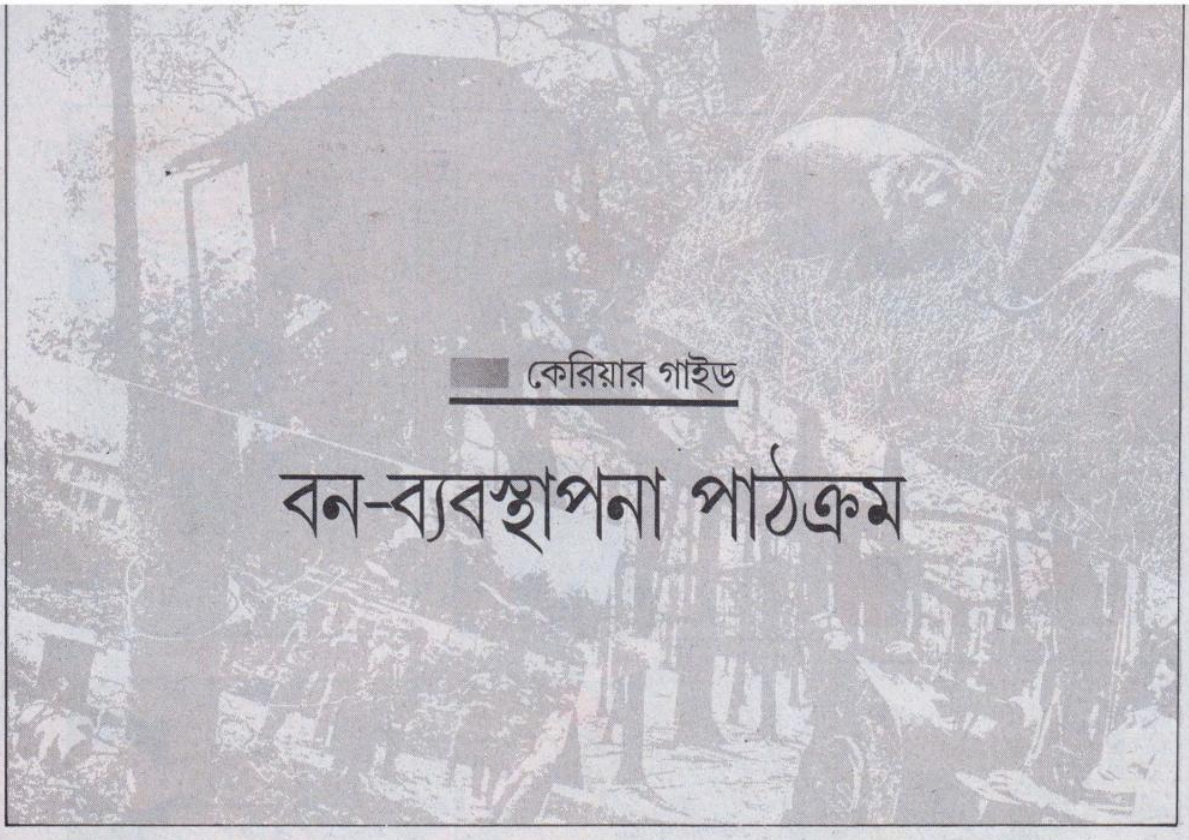

কেরিয়ার গাইড

বন-ব্যবস্থাপনা পাঠক্রম

পরিবেশ সচেতনতা বাড়ার সঙ্গে-সঙ্গে বনসৃজন, সংরক্ষণ বিষয়ে দক্ষ কর্মীর চাহিদা বেড়েছে, দরকার আরও কুশলী বন-ব্যবস্থাপকের। হাতে-কলমে কাজ শিখে বন-ব্যবস্থাপক হওয়ার স্বপ্ন সফল করতে বন-ব্যবস্থাপনা পাঠক্রমের জুড়ি নেই। এবারের আলোচনা এই বিষয়েই।

জাতীয় অর্থনীতিতে বনসম্পদের ভূমিকা অনস্বীকার্য। এসব দিক বিবেচনা করে ভারত সরকারের পরিবেশ বনসম্পদ ও বন্যপ্রাণী মন্ত্রক ১৯৮২ সালে ভোপালের নেহরু নগরে সুন্দর প্রাকৃতিক পরিবেশে ৮০ হেক্টর জায়গা জুড়ে গড়ে তুলেছে বন-ব্যবস্থাপনা বিদ্যার এক অনন্য শিক্ষায়তন, ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অব ফরেস্ট ম্যানেজমেন্ট। বনসম্পদ প্রশাসনিক শিক্ষার ক্ষেত্রে এই শিক্ষায়তনের তুলনা নেই। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির ব্যবহারিক প্রয়োগের সঙ্গে-সঙ্গে পরিবেশ ও প্রকৃতির ভারসাম্য বজায় রাখার জন্য এই শিক্ষায়তন কৃতিত্বের সঙ্গে তৈরি করে চলেছে সুদক্ষ বন-ব্যবস্থাপক বা বন-প্রশাসক।

পাঠক্রম

আগেই বলেছি, বন-ব্যবস্থাপক তৈরির গুরুদায়িত্ব পালন করে এই শিক্ষায়তন। এবার বিশদভাবে জানা দরকার, বনসম্পদ প্রশাসনের ক্ষেত্রে কী ধরনের শিক্ষাক্রম চালু হয়েছে। এখানে দু' বছরের পোস্ট গ্র্যাজুয়েট ডিপ্লোমা ইন ফরেস্ট্রি ম্যানেজমেন্ট কোর্স অর্থাৎ পি জি ডি এফ এম কোর্স পড়ানো হয়। এ ছাড়া বিভাগীয় কর্মীদের জন্য এক বছরের এম. ফিল কোর্স পড়ানোরও ব্যবস্থা আছে। তা ছাড়া আছে বিভিন্ন ম্যানেজমেন্ট ডিভেলপমেন্ট পাঠক্রম, গবেষণা ও পরামর্শ (কনসালট্যান্সি) বিভাগ।

শিক্ষাগত যোগ্যতা

বন-ব্যবস্থাপনার দু' বছর মেয়াদের পাঠক্রমে ভর্তি হতে হলে প্রার্থীকে যে-কোনও শাখার স্নাতক হতে হবে এবং স্নাতকস্তরে কমপক্ষে 'এগ্রিগেট'-এ ৫০ শতাংশ নম্বর পেয়ে পাশ করতে হবে। তফসিলি প্রার্থীদের অবশ্য ৪৫ শতাংশ নম্বর পেয়ে পাশ করলেই হবে। আর এই নম্বরের হার মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক স্তরেও বজায় রাখা চাই। অর্থাৎ মাধ্যমিক পর্যায় থেকে শুরু করে স্নাতকস্তর পর্যন্ত সব স্তরেই ৫০

শতাংশ (তফসিলি ক্ষেত্রে ৪৫ শতাংশ) নম্বরসহ পাশ করতেই হবে। শিক্ষাগত যোগ্যতার সঙ্গে-সঙ্গে বয়সের মাপকাঠির একটা ব্যাপারও আছে। মনে রাখতে হবে, ১৪ জুন '৯৬ তারিখের হিসেবে প্রার্থীর বয়স যেন কোনওভাবেই ২৮ বছরের বেশি না হয়।

মনোনয়ন পদ্ধতি

প্রার্থী মনোনয়নের জন্য জাতীয় স্তরে সারা দেশ জুড়ে প্রতিযোগিতামূলক লিখিত পরীক্ষার ব্যবস্থা করা হয়। লিখিত পরীক্ষায় সফল প্রার্থীদের যোগ দিতে হয়'গ্রুপ ডিসকাশন'ও ইন্টারভিউয়ে। এভাবেই চূড়ান্ত প্রার্থী তালিকা তৈরি হয়। লিখিত পরীক্ষার বিষয়সূচির মধ্যে থাকে : 'ইংলিশ কমপ্রিহেনশন', 'প্রবলেম সল্‌ভিং', 'অ্যানালিসিস অব সিচুয়েশন', 'সাফিসিয়েন্সি অব ডেটা', 'রাইটিং এবিলিটি অ্যান্ড জেনারেল অ্যাওয়ারনেস'। লিখিত পরীক্ষা হবে ১৮ ফেব্রুয়ারি, ১৯৯৬।

পরীক্ষা-কেন্দ্র

আগেই জানিয়েছি, সারা দেশ জুড়ে নেওয়া হয় এই প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষা, সেজন্য বেশিরভাগ গুরুত্বপূর্ণ শহরে পরীক্ষা-কেন্দ্র খোলা হয়। প্রার্থীদের সুবিধের জন্য পরীক্ষা-কেন্দ্রের নাম ও কোড নম্বর উল্লেখ করা হল। যেমন, আহমেদাবাদ (০১), বাঙ্গালোর (০২), ভোপাল (০৩), ভুবনেশ্বর (০৪), বম্বে (০৫), কলকাতা (০৬), চণ্ডীগড় (০৭), দিল্লি (০৮), গুয়াহাটি (০৯), হায়দরাবাদ (১০), জয়পুর (১১), লখনউ (১২), মাদ্রাজ (১৩), নাগপুর (১৪), পটনা (১৫), থিরুভনন্তপুরম (১৬)।

পড়াশোনার সুযোগ

এখানে স্নাতক পর্যায়ের যে শিক্ষাক্রম পড়ানো হয় তার মূল উদ্দেশ্য হল, (১) বনসৃজন ও বন

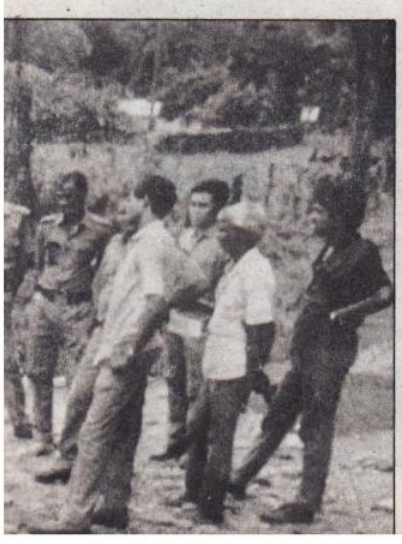

সংরক্ষণের নানা বিজ্ঞানসম্মত এবং কারিগরি দিকের সঙ্গে শিক্ষার্থীদের পরিচয় করিয়ে দেওয়া ; (২) বিভিন্ন স্তরের মানুষের সমস্যার সঙ্গে মানবিক ও কারিগরি অভিজ্ঞতার সংমিশ্রণ ঘটানো ; (৩) প্রশাসক হিসেবে সমস্যার মূল্যায়ন এবং সমাধানের নীতি নির্ধারণ প্রক্রিয়া শেখানো। এ ছাড়া বনসম্পদ, বন্যপ্রাণী, পরিবেশগত নানা দিক সম্বন্ধেও বাস্তব জ্ঞান দেওয়া হয় শিক্ষার্থীদের। এ-দেশের হাজার-হাজার মানুষের জীবিকার প্রশ্ন জড়িয়ে আছে বনজ শিল্পের সঙ্গে। সুতরাং অর্থনৈতিক সমস্যার সমাধান এবং পরিবেশের ভারসাম্য আনার কঠিন দায়িত্ব পড়ে বন-প্রশাসকের ওপর। এখানকার স্নাতকদের সেভাবেই নানা সমস্যার

হাতে-কলমে শিক্ষা দেওয়া হয়। স্নাতকোত্তর এই শিক্ষাক্রমের মেয়াদ ৮৫ সপ্তাহ। ছুটি বাদ দিয়ে ৮০ সপ্তাহ কার্যকালকে আট ভাগে ভাগ করে নেওয়া হয়। এক-একটি কার্যক্রমে থাকে ১০ সপ্তাহের পাঠক্রম। এর মধ্যে ৫ সপ্তাহের ক্লাস হয় ঘরে বসে, ১ সপ্তাহ চলে 'ফিল্ড ওয়ার্ক' এবং বাকি ২ সপ্তাহ সাংগঠনিক প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। ক্লাসের থিয়োরি পেপারের সঙ্গে ফিল্ডওয়ার্ক ও সাংগঠনিক ট্রেনিংয়ের এমন সুসম্পর্ক থাকে, যাতে পুরো বিষয়টি শেখা হয়ে যায়।

ফিল্ড ওয়ার্কের মধ্য দিয়ে বন সম্বন্ধে ছাত্রছাত্রীরা বাস্তব জ্ঞান সঞ্চয় করে। গ্রামীণ আর্থসামাজিক কাঠামো, আদিবাসী এবং দরিদ্র গ্রামবাসীদের সমস্যা ইত্যাদি বিষয়েও সচেতন করা হয় তাঁদের। অভিজ্ঞ ফরেস্টার, শিক্ষাবিদ, বিজ্ঞানী এবং প্রশাসকদের এখানে বিভিন্ন বিষয়ে বক্তব্য রাখবার সুযোগ দেওয়া হয়। তাঁরা বনসম্পদ ও বনজ শিল্প সংক্রান্ত নানা সমস্যার সমাধান এবং সম্ভাবনা বিষয়ে আলোচনা করেন। এই বক্তব্য ও আলোচনা শিক্ষার্থীদের বাস্তব জীবনে খুবই কাজে লাগে।

এখানে শিক্ষারীতির মধ্যেও আছে অভিনবত্ব। পুরো ব্যাপারটাই হাতে-কলমে শেখানো হয়। মানবিক ও সামাজিক দক্ষতা বিষয়ে শেখানোর সময় ফিল্ড ওয়ার্ক ও সাংগঠনিক ট্রেনিংয়ের ওপর জোর দেওয়া হয়। তা ছাড়া গ্রামীণ সমাজতত্ত্ব এবং সাংগঠনিক রূপরেখার বিষয়ে বিশদভাবে শেখানো হয়। ফিল্ম ও বক্তৃতার মাধ্যমে এমনকী ঘুরে-ঘুরে বিভিন্ন কারিগরি তথ্য বিষয়ে সচেতন করানো হয়। সর্বোপরি আছে অধীত বিদ্যার প্রয়োগকৌশল, নীতি নির্ধারণ ও সংগঠনের লক্ষ্যে পৌঁছনোর বিষয়ে কোনও বিশেষ কাজে ছাত্রছাত্রীদের নিয়োগ করে হাতেনাতে শিক্ষা দেওয়া। সঙ্গে আনুষঙ্গিক বিষয়সূচি, সাংগঠনিক অনুশীলন, খেলাধুলো ইত্যাদি বিষয়ের সাহায্য নেওয়া হয়।

বিশেষ কাজের দায়িত্ব নিয়ে সেই 'টার্ম পেপার' দাখিল করতে হয় ছাত্রছাত্রীদের। আলোচনা হয় 'স্ট্র্যাটেজি' ও 'পলিসি' নিয়ে। প্রয়োজনে নীতি নির্ধারক, পরিকল্পনাকারদের সঙ্গেও আলোচনার ব্যবস্থা করা হয়। ক্লাসে শেখানো বিষয়ের সঙ্গে তার প্রয়োগ, বাস্তব সমস্যা, প্রশাসনিক দক্ষতা, নীতি নির্ধারণ সমস্ত কিছুই একবারে শেখানো হয়ে থাকে। শিক্ষাক্রম এমনভাবে সাজানো হয়েছে যাতে, ছাত্রছাত্রীদের সমানভাবে ক্লাসও করতে হয়, ফিল্ড ওয়ার্কেও অংশ নিতে হয়। সেক্ষেত্রে আলাদাভাবে তার মূল্যায়ন করা হয়ে থাকে। সুতরাং ভাল ফল করতে হলে টার্ম পরীক্ষার সঙ্গে ফিল্ড ওয়ার্ক, 'ট্রেনিং' সব বিষয়ে সমানভাবে জোর দিতে হয়।

পড়াশোনার খরচ

এই ইনস্টিটিউটে পড়তে গেলে ছাত্রছাত্রীদের তেমন কোনও খরচ নেই। কেননা প্রতিটি ছাত্রছাত্রীকেই মাসে এক হাজার টাকা করে 'স্কলারশিপ' দেওয়া হয়। এই টাকা থেকেই ছাত্রছাত্রীদের পড়ার খরচ জোগাড় হয়ে যেতে পারে।

ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা

এই ইনস্টিটিউটে 'ক্যাম্পাস রিক্রুটমেন্ট'-এর সুযোগ আছে। পড়াশোনা চলার সময় অনেক সংস্থা এই ইনস্টিটিউটে আসে তাদের প্রয়োজনীয় কুশলী কর্মী নিয়োগের প্রস্তাব নিয়ে।

ইনস্টিটিউটের নিয়োগ কার্যালয় ছাত্রছাত্রী ও বিভিন্ন সংস্থার সঙ্গে এই অর্থকরী যোগাযোগ

(এর পরে ২০ পাতায়)

পরের দিন...
রাজার সই-দেওয়া নথিটি দেখালেই আপনি রত্নভাণ্ডারে ঢুকতে পারবেন। লেঃ ক্রোমির আপনাকে নিয়ে যাবেন...
ক্রোপো দুর্গে আছে এই রত্নভাণ্ডার। ওখানে মোতায়েন করা হয়েছে বিশেষ প্রহরী।
রাজার অনুমতিপত্র।
প্রোফেসর, আমার সঙ্গে আসুন।
দেখে মনে হচ্ছে, বেশ সুরক্ষিত।
হ্যাঁ। এখানে চুরি করার মতো লোক এখনও জন্মায়নি।
এখানেই রত্নভাণ্ডার, প্রোফেসর !...

ওটোকারের রাজদণ্ড

এটা স্মারকশালা, পাশেই রত্নভাণ্ডার। ক্ষমা করবেন, কিন্তু যতক্ষণ আপনি এখানে থাকবেন ততক্ষণ দু'জন প্রহরী আপনার সঙ্গে থাকবে। বাইরে থেকে দরজাটাও তালা দেওয়া থাকবে এটাই নির্দেশ। আশা করি, অপরাধ নেবেন না।

মোটেই না....

ইতিমধ্যে....

ছেলেটিকে ক্লো শহরে নিয়ে যাও, সাঙ্ঘাতিক ছেলে। সরকারি ব্যাপারে নাক গলাচ্ছে। ওপরমহল থেকে বলা হয়েছে, ছেলেটি ক্লো শহরে না পৌঁছলেই ভাল।

এটাই হুকুম... তুমি ভান করবে, গাড়িটা খারাপ হয়ে গেছে। এঞ্জিনটা দেখবে, বন্দি পালানোর চেষ্টা করবে... তারপর... বুঝতে পারছ ?

হ্যাঁ, কিন্তু ও যদি পালাতে না চায় ?

চিন্তা কোরো না !...পালাবেই !...

ভাবছি, কে এটা পাঠাল ? কোনও বন্ধু ?... কেমন বন্ধু ?

সাবধান ! তোমাকে ক্লো শহরে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে গুলি করে মারার জন্য। অবশ্যই পালিয়ো। গাড়িতে যেতে-যেতে ঘুমনোর ভান কোরো। ড্রাইভার আমাদের বন্ধু। সে ভান করবে, যেন গাড়ি খারাপ হয়ে গেছে। প্রহরীরাও থাকবে না। তখনই তুমি পালাবে।

বন্ধু

চিঠিটা বরং নষ্ট করে ফেলি। যদি তল্লাশি করে।

কুট্টুস, এটা গিলে ফ্যাল।

তাড়াতাড়ি কুট্টুস, কেউ আসছে মনে হয়।

ভাবছ, কাগজটা গিলে ফেলা সহজ ?

(এর পরে আগামী সংখ্যায়)

(১৭ পাতার পর)

ঘটিয়ে দেন। 'ট্রাইফেড', 'এন টি পি সি', 'ইফকো', 'এইচ পি সি', 'ফরেস্ট ডিভেলপমেন্ট কর্পোরেশন', 'সোসাইটি ফর প্রিভেনশন অব ওয়েটল্যান্ডস ডিভেলপমেন্ট', 'ওয়ার্ল্ড ব্যাঙ্ক, ফোর্ড ফাউন্ডেশন', 'উইমকো', 'জে কে কর্পোরেশন লিঃ', 'টাটা এনার্জি রিসার্চ ইনস্টিটিউট', 'সেন্টার ফর সায়েন্স অ্যান্ড এনভায়রনমেন্ট' ইত্যাদি সংস্থা ইনস্টিটিউটের ছাত্রছাত্রীদের সাংগঠনিক প্রশিক্ষণের সুযোগ দেয়। এই সব সংস্থায় তাদের নিয়োগেরও সম্ভাবনা থাকে। বিভিন্ন সংস্থায় ট্রেনিংয়ের সময় ছাত্রছাত্রীরা গড়ে ৫০০০ টাকা আর্থিক সাহায্য পেয়ে থাকেন। আর স্নাতক হওয়ার পর বিভিন্ন সংস্থায় কাজের সুযোগ পাওয়ার পর তারা মাসিক আট থেকে ১০ হাজার টাকা বেতনে নিয়োগের সুযোগ পান।

আবেদনের নিয়ম

এই স্নাতকোত্তর পাঠক্রমে ভর্তি হতে হলে কীভাবে আবেদন করতে হবে সেটা জানা দরকার। আলাদাভাবে আবেদনপত্র সংগ্রহ করতে হবে না। একটি নির্দিষ্ট 'ফরম্যাট'-এ আবেদন করতে হবে। সহজেই এই ফরম্যাটটি তৈরি করে নেওয়া যেতে পারে। একটি সাদা কাগজ নিন। সবচেয়ে ওপরে ইংরেজি বড় অক্ষরে লিখুন, 'অ্যাডমিশন ফর পি জি ডি এফ এম (সেশন ১৯৯৬-'৯৮)'। পরে বাঁ দিক থেকে শুরু করুন। এবারও সব ইংরেজি 'ক্যাপিটাল লেটার' ব্যবহার করুন। প্রথম লাইনে লিখুন, 'ডিটেল্স অব ডিম্যান্ড ড্রাফ্ট এনক্লোজড', তার নীচে অ্যামাউন্ট, ডি-ডি নম্বর, ডেট অব ইসু, ব্যাঙ্ক পর পর নীচে-নীচে লিখে যান। এর পর নীচের লাইনে লিখুন, বাঁ দিকে চয়েস অব সেন্টার, একটু ফাঁকা জায়গা রেখে, লিখুন 'সেন্টার' শব্দটি ; নীচে 'ফার্স্ট প্রেফারেন্স'... 'সেকেন্ড প্রেফারেন্স'... ডান দিকে একদম শেষের দিকে জায়গা রাখুন 'কোড' লেখার।

এর পর নীচের অংশে লিখতে হবে 'বায়োডেটা'। পর পর ক্রমিক সংখ্যা ওয়ান, টু থেকে সেভেন পর্যন্ত লিখুন। এবার ওয়ান থেকে শুরু করে লিখে যান, 'নেম ইন ফুল', 'ফাদার্স নেম', 'ডেট অব বার্থ', 'সেক্স', 'হোয়েদার এস সি/এস টি', 'পোস্টাল অ্যাড্রেস', 'এডুকেশনাল কোয়ালিফিকেশন', 'স্টার্টিং ফ্রম ম্যাট্রিকুলেশন অনওয়ার্ডস' (ডু নট সেন্ড সার্টিফিকেট)। নীচের লাইনে পর পর 'স্পেস' রাখুন (ঘর কেটেও লিখতে পারেন)। 'এক্সাস পাসড', 'বোর্ড/ইউনিভার্সিটি', 'ইয়ার অব পাশিং', 'সাবজেক্ট টেকেন', 'এগ্রিগেট অব মার্কস'। শেষ অংশে 'ডিক্লারেশন'। 'আই হেয়ারবাই ডিক্লেয়ার দ্যাট অল স্টেটমেন্টস গিভেন অ্যাবাভ ইন দ্য অ্যাপ্লিকেশন ফর্ম আর ট্রু', 'কমপ্লিট অ্যান্ড কারেক্ট টু দ্য বেস্ট অব মাই নলেজ অ্যান্ড বিলিফ। ইন দ্য ইভেন্ট অব এনি ইনফরমেশন বিং ফাউন্ড ফল্স অর ইনকারেক্ট, মাই অ্যাডমিশন, উড স্ট্যান্ড ক্যানসেলড উইদাউট এনি নোটিশ।' 'প্লেস', 'ডেট'—বাঁ দিকে লিখুন, আর ডান দিকে 'সিগনেচার অব ক্যান্ডিডেট'। একটা পুরো অ্যাপ্লিকেশন ফর্ম তৈরি হয়ে গেল। টাইপ করে বা হাতে লিখে পাঠাতে পারেন। প্রয়োজনে ভারত সরকারের 'এমপ্লয়মেন্ট নিউজ' (৪—১০ নভেম্বর) সংখ্যা দেখে নিন।

বেশ মন দিয়ে ফর্মটি পূরণ করবেন যাতে তথ্যবিভ্রান্তি না ঘটে বা ভুল না থাকে। ফর্মের সঙ্গে পাঠাবেন : (ক) সম্প্রতি তোলা দুটি পাশপোর্ট সাইজের ফোটোগ্রাফ (একটি সাদা কাগজে সেঁটে দিন এবং ফোটোগ্রাফের ওপর পুরো নাম লিখুন) ফোটোগ্রাফ দুটি প্রত্যয়িত অর্থাৎ 'অ্যাটেস্টেড' হওয়া দরকার। (খ) প্রয়োজনে ফর্মের সঙ্গে এস সি/ এস টি-র জাতিগত সার্টিফিকেটের প্রত্যয়িত নকল দিন। (গ) চার টাকা মূল্যের ডাকটিকিটযুক্ত নাম-ঠিকানা লেখা ২৮×২৩ সেন্টিমিটার মাপের একটি সাদা খাম দিন। (ঘ) একটি ডিম্যান্ড ড্রাফ্ট ২০০ টাকা মূল্যের (তফসিলি ক্ষেত্রে ৫০ টাকা মূল্যের) সঙ্গে দিতে হবে। ড্রাফ্টটি ডিরেক্টর, আই আই এফ এম-এর অনুকূলে কাটা হওয়া চাই। যে-কোনও রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কের ভোপাল শাখার ওপর ড্রাফ্টটি কাটা হলেই হবে। এবার এইসব প্রমাণপত্র ইত্যাদি সহ পূরণ করা ফর্মটি পাঠাতে হবে—দ্য কো-অর্ডিনেটর পি জি পি-অ্যাডমিশন, ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অব ফরেস্ট ম্যানেজমেন্ট, পোস্ট বক্স নং ৩৩৫, নেহরুনগর, ভোপাল-৪৬২০০৩ (মধ্যপ্রদেশ) ঠিকানায়। ফর্ম জমা দেওয়ার শেষ তারিখ, ১৮ ডিসেম্বর ১৯৯৫।

অন্যান্য সুযোগ

ইনস্টিটিউটে ছাত্রছাত্রীদের জন্য হস্টেলের সুব্যবস্থা আছে। তা ছাড়া আছে 'ইনডোর' ও 'আউটডোর গেম্স'-এর সব সুযোগ-সুবিধে। ছাত্রছাত্রীদের পড়াশোনার সুবিধের জন্য ইনস্টিটিউটের ক্যাম্পাসের মধ্যেই আছে লাইব্রেরি এবং কম্পিউটার সেন্টার। লাইব্রেরিতে 'ফরেস্ট্রি', 'ইকোলজি', 'ম্যানেজমেন্ট অ্যান্ড অর্গানাইজেশনাল বিহেভিয়ার', বন-প্রশাসন বিষয়ে প্রচুর বিদেশি পত্র-পত্রিকা ও প্রয়োজনীয় বইপত্র আছে। ক্যাম্পাসটি সুন্দরভাবে বিন্যস্ত। এখানে আছে 'অ্যাকাডেমিক কমপ্লেক্স', লাইব্রেরি, কম্পিউটার সেন্টার, হস্টেল প্রভৃতি। তফসিলি জাতি ও উপজাতি ছাত্রছাত্রীদের জন্য ভর্তির ক্ষেত্রে আসন সংরক্ষণেরও ব্যবস্থা আছে।

পি জি ডি এফ এম কোর্স : এক নজরে

শিক্ষাগত যোগ্যতা : মাধ্যমিক পর্যায় থেকে স্নাতক পর্যায় পর্যন্ত এগ্রিগেটে ৫০ শতাংশ নম্বরসহ স্নাতক। (তফসিলির ক্ষেত্রে ৪৫ শতাংশ)

বয়স : ১৪ জুন ১৯৯৬ তারিখের হিসেবে সবচেয়ে বেশি ২৮ বছর।

লিখিত পরীক্ষা : ১৮ ফেব্রুয়ারি ১৯৯৬।

আবেদন করার শেষ দিন : ১৮ ডিসেম্বর '৯৫।

যোগাযোগ : পি জি পি অ্যাডমিশন কো-অর্ডিনেটর, ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অব ফরেস্ট ম্যানেজমেন্ট, পোস্ট বক্স ৩৩৫, নেহরুনগর, ভোপাল-৪৬২০০৩।

অমর দাশ

পরিত্যক্ত খনিতেও গড়ে উঠতে পারে পর্যটন-কেন্দ্র

জাপানের বেশ কিছু পরিত্যক্ত খনি নিয়ে চলছে নানা উল্লেখযোগ্য গবেষণা। লিখেছেন **ভাস্কর সেনগুপ্ত**

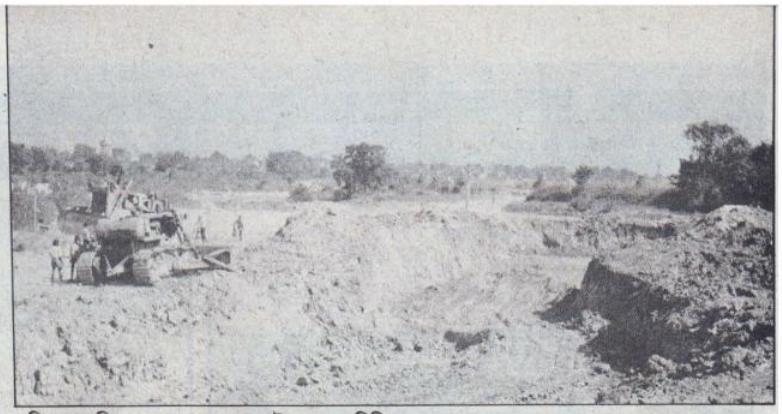

পরিত্যক্ত খনিকে কাজে লাগানোর চেষ্টা চলছে পৃথিবীর নানা দেশে

পরিত্যক্ত খনিতে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির নানা গবেষণা, খাওয়ার উপযোগী মাশরুম বা ছত্রাকের চাষ, রকেট উৎক্ষেপণ, এমনকী আকর্ষক পর্যটন-কেন্দ্র হিসেবেও গড়ে তোলা যায়। জাপানে ৫৬টি পরিত্যক্ত খনির মধ্যে অর্ধেকের বেশি খনিতে এরকম ৩৫টি প্রকল্প শুরু হয়ে গিয়েছে। কামাইশি মাইনিং কোম্পানি ১৯৯১ সালে ফেব্রুয়ারি থেকে তাদের পরিত্যক্ত খনিগর্ভে ফলাচ্ছে 'শিতাকে' নামে একরকমের ব্যাঙের ছাতা, যা বিক্রি হচ্ছে টোকিওর বাজারে। খনি থেকে উদ্ভূত জল উৎকৃষ্ট মিনারেল ওয়াটারে পরিণত হয়ে বোতলে করে বাজারে চলে যাচ্ছে। কামাইশি তৈরি করছে দিনে ৫৫০০ লিটার খনিজ জল। জাপানের বৃহত্তম এই খনি থেকে তোলা হত তামা এবং ম্যাগনেটাইট আকর। কামাইশি সংস্থা এখন সরকারি ও বেসরকারি সংস্থাগুলিকে তাদের খনিগর্ভে ভূগর্ভের তাপকে কাজে লাগিয়ে বিদ্যুৎ উৎপাদন, ভূমিকম্প নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা,পচনশীল খাদ্যের সংরক্ষণ ইত্যাদি নিয়ে গবেষণা-কেন্দ্র গড়ে তোলার জন্য উদ্যোগ নিচ্ছে। খনিগর্ভে শব্দ, আলো, বিদ্যুৎ-তরঙ্গের প্রভাব নেই, এর আর্দ্রতা সবসময়েই একটা নির্দিষ্ট মাত্রায় থাকে। এ ছাড়া কঠিন পাথরে তৈরি হওয়ায় ঘরের মতোই ব্যবহার করা যায় বলে বিভিন্ন গবেষণার পক্ষে পরিত্যক্ত খনি একেবারে আদর্শ। কামাইশি সংস্থা খনির ছাদ থেকে ঝরে পড়া ফোঁটা ফোঁটা জল পরিত্যক্ত ম্যাগনেটাইটের গুহায় সঞ্চিত করে তা থেকে বিদ্যুৎ উৎপাদনের একটি প্রকল্প নিয়েছে। যার ফলে আগামী ছ' বছরের মধ্যে পাওয়া যাবে ৫০০ কিলোওয়াট বিদ্যুৎ। আর এই বিদ্যুৎ দিয়ে খনির যাবতীয় গবেষণা-কেন্দ্র ও অন্যান্য কাজকর্ম চলবে। কামাইশি ছাড়া অন্যান্য খনি কোম্পানিও তাদের পরিত্যক্ত খনিগর্ভগুলিকে নানা কাজে লাগাচ্ছে। হোক্কাইডোর সুনাগাওয়া কয়লাখনিতে গড়ে উঠেছে মাইক্রোগ্র্যাভিটি কেন্দ্র, যেখানে ভূপৃষ্ঠের অভিকর্ষীয় টানকে হাজার ভাগের এক ভাগে নামিয়ে এনে চলছে নানা দুরূহ পরীক্ষা-নিরীক্ষা। গিফু-র কামোইকা খনিতে চলছে নিউট্রিনো নিয়ে গুরুত্বপূর্ণ গবেষণা। কোনও-কোনও সংস্থা পরিত্যক্ত খনিগর্ভে রকেট উৎক্ষেপণ-মঞ্চ, 'সেমিকন্ডাক্টর' বা 'অতিপরিবাহী' পদার্থ তৈরির কারখানা, পর্যটক আকর্ষণ, এমন কী হাসপাতাল গড়ে তোলার কথাও ভাবছে। জাপানের সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজি এজেন্সির মতে, সমুদ্র এবং মহাকাশের পরই প্রযুক্তি ও বিজ্ঞান গবেষণায় মানুষের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কর্মক্ষেত্র হয়ে উঠবে খনিগর্ভ।

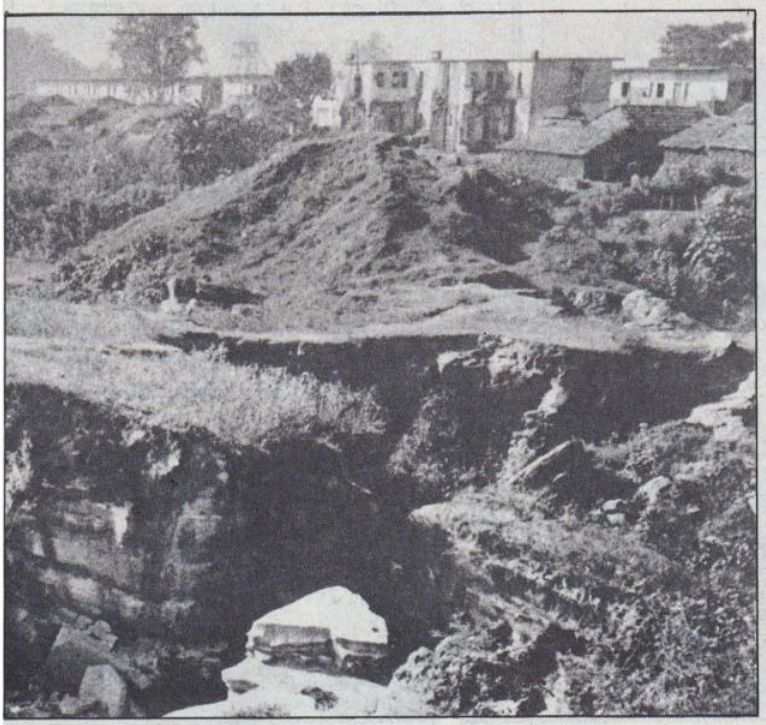

!?!
?
স্লেজ দাঁড়িয়ে আছে। আর সময় নষ্ট করা যায় না। আবার তুষারঝড় আসতে পারে।
ঠিক কথা.... যেতেই হবে।
বেচারা জোকো! ....তোমার সঙ্গে আর দেখা হবে না....
কূলের চিহ্ন নেই। সমুদ্রে এসে পড়েছি।

(এর পরে আগামী সংখ্যায়)

ভূতের গল্প

ফিরে এল লছা

পিনাকীনন্দন চৌধুরী

অমাবস্যার রাত। অন্ধকার জমাট বেঁধে আছে গাছটার নীচে। একটা নিঃসঙ্গ বট, কালো রাতের কাট আউটের মতো দাঁড়িয়ে।

বাসটা অরিন্দমকে নামিয়ে দিয়ে হুস করে চলে গেল। অরিন্দম একাই নামল তেমাথানির মোড়ে। বাসের পেছনের দু'টো শেয়াল-চোখের দিকে চেয়ে রইল অরিন্দম। যতক্ষণ দেখা যায়। আর, সেই আলোকবিন্দুর ভরসাটুকু মিলিয়ে যেতেই এক অশরীরী অন্ধকার জাপটে ধরল তাকে। এই মুহূর্তে আড়ষ্ট অসাড় অরিন্দম আতঙ্ক আর অন্ধকারকে পৃথক করতে পারছে না।

অথচ বেশ একটা খুশি-খুশি ফুরফুরে মেজাজে বাস থেকে নেমেছিল সে। স্মৃতির চাবিগুচ্ছ ঝমঝম করছিল তার বুকে।

বিশ বছর। নাহ্ ঠিক হিসেব হল একুশ বছর তিন মাস পরে মামার বাড়ি যাচ্ছে অরিন্দম। যেখানে কেটেছে তার গোটা কৈশোর। স্কুল ফাইনাল পাশ করেছে পাশের গ্রাম চন্দনপুর স্কুল থেকে। তারপর কলকাতা শহর, রাজধানী দিল্লি আর বিদেশ-বিভুঁই। একুশটা বছর উড়ে ঝরে গেছে এলোমেলো হাওয়ায়।

মামাতো বোনের বিয়ে। টুসিকে সে দেখেছে। তখন সে তিন বছরের ডলপুতুল। এখন কী-যেন একটা ভারী ঝমঝমে নাম টুসির। নেমন্তন্নপত্রে ছাপা আছে। বাবা বললেন, "তোর তো অরু লম্বা ছুটি। তুই যা। চৌধুরীবাড়ির নিমন্ত্রণটা রক্ষা করে আয়।" মামার বাড়ি যাওয়ার কথাটা শোনামাত্র তিরতিরে হাওয়া দিল জানলা ছোঁয়া গুলমোহরের শাখায়। কিন্তু পরক্ষণেই গাঁইগুঁই করে উঠল অরিন্দম, মাতুলালয়ের দুর্গম পথটার কথা ভেবে। বাসস্টপ থেকে পাক্কা তিন ক্রোশ হন্টন। এঁটেল মাটির পথে হাঁটু ভর্তি কাদা। উঃ! দাপানো ঝাঁপানো কৈশোরে এটা অবশ্য কোনও ব্যাপারই ছিল না। মামাতো ভাইদের সঙ্গে কতবার ফিরেছে এগরা থেকে। সাঁঝপেরনো জ্যোৎস্নায়। কখনও-বা মধ্যনিশির ঠাসবুনুন অন্ধকারে। ডুলু গেয়ে উঠত, 'দুর্গম গিরি কান্তার মরু...' সঙ্গে-সঙ্গে কুলুর গলায় মিহি সুর খেলত, 'ফিরিবে কপোত নীড়ে, আধো আলো আধো ছায়াতে...'। সে এক সময় গেছে। অরিন্দম বলে, "বেস্ট পিরিয়ড অব মাই লাইফ।" গুলতি ঘুঘু, ফুটবল, হাডুডু, রাস ঝুলন, মধ্যরাত অবধি জলসাঘরে সেতার তবলার ডুয়েল। আর সবচেয়ে মজার ছিল, ভাই-বোনদের নিয়ে থিয়েটার। বছরে অন্তত দু'বার। 'চন্দ্রগুপ্ত', 'বঙ্গে বর্গী,' 'দুর্গাদাস'....

অরিন্দম এখন বড়সড় অফিসার। বছরসাতেক বিদেশের হাওয়াবরফ লেগেছে তার চামড়ায়। তাই বাল্যের টলমলে স্মৃতি আর দুর্গম

গ্রাম্য পথটার মধ্যে একটা 'টাগ অব্ ওয়ার' চলছিল তার মনের ভেতর। মিনমিন করে বলল, "সস্তু যাক না। যা রাস্তা! উরেব্বাস!"

সঙ্গে-সঙ্গে মেজোকাকু বললেন, "উ-রে-ব্বা-স? তই দেখছি এখনও কুড়ি বছর পেছিয়ে আছিস অরু। দেশের অবস্থার খোঁজখবর রাখিস না কিসসু। পালটে গেছে রে। যা না, দ্যাখগে যা। গ্রাম বাংলার হালফিল চেহারাটা। বদলে গেছে। এগরা থেকে বাস, ট্রেকার ছুটছে অহরহ।"

"তা-ই-ই!" অরিন্দমের অবিশ্বাসী কণ্ঠে অপার বিস্ময়!

"নয়তো আর বলছিটা কী।" কাকু একটিপ জরদা মুখে ফেলে বললেন, "আর, তেমাথানি থেকে তো তিন কিলোমিটার। সেও এখন মোরাম রাস্তা। ওখানে গণ্ডায়-গণ্ডায় রিক্শা। 'টোয়েন্টি ফাইভ টু হাফ্ অ্যান আওয়ার ওনলি'। আগের দিন আর নেই রে সাহেব।"

কী কুক্ষণেই না রাজি হয়েছিল অরিন্দম! আর এখন? অন্ধকার ভালুকটা নখ বসাল তার বুকে। মেজোকাকুর ইনফরমেশন কিন্তু নির্ভেজাল। হলে কী হবে? যা ঘটার ঘটে গেল, এগরা পৌঁছনোর আগেই। বিক্ষোভ অবরোধে ছ' ঘণ্টা ট্রেন লেট। এরপর তিরিশ কিলোমিটার বাসে। দুপুর দু'টোর জায়গায় অরিন্দম এগরায় নামল রাত দশটা নাগাদ। গোদের ওপর বিষফোঁড়া। জানা গেল, এত রাতে আর কিছুই পাওয়া যাবে না পটাশপুর লাইনে। সব্বনেশে কাণ্ড! আকাশ ভেঙে পড়ল অরিন্দমের মাথায়। তাও আবার ফাঁকা আকাশ নয়। ঘন কৃষ্ণবর্ণ মেঘের ভিজে কম্বলে ঢাকা ভারী আকাশ। সুটকেসটা একটা গুমটির বেঞ্চিতে রেখে ইষ্টনাম স্মরণ করছে অরিন্দম। আনন্দ-উৎসব, স্মৃতির আকর্ষণ সবই মুছে গেছে উৎকণ্ঠায়। সহসা দৈবানুগ্রহ। বাসের বডিতে চাঁটি মারতে-মারতে "মেচেদা, মেচেদা" চিৎকার। একটা বাস এসে দাঁড়াল। সন্ধে সাতটার গাড়ি 'ব্রেকডাউন' করেছিল। সারিয়েসুরিয়ে রওনা দিচ্ছে সাড়ে দশটায়। গুটি কয়েক প্যাসেঞ্জার টিমটিম করছে বাসের খালি পেটে। তড়াক করে লাফিয়ে বাসে উঠল অরিন্দম। সুটকেসটা পাশে নিয়ে জাঁকিয়ে বসল। নিশ্চিন্ত এখন। ফাঁড়া কেটে গেছে। পরক্ষণেই একটা ভাবনা খিচখিচ করে উঠল আবার। এতরাতে রিকশা মিলবে তো! ওর তো পৌঁছনোর কথা বেলা তিনটে নাগাদ। বড়মামা চিঠি লিখেছেন অবশ্য লোক থাকবে তেমাথানির মোড়ে।

এখানে এখন একটা নির্জনতা ঘাপটি মেরে বসে আছে শুধু। কোথায় লোক! কোথায় রিকশা। কাছেপিঠে কোথাও বৃষ্টি হয়ে গেছে। ভিজে হাওয়া এসে আশ্রয় খুঁজছে বটতলায়। ওই বটতলা পেরিয়েই এগিয়ে যেতে হবে পঁচেট গড় যাওয়ার মোরাম রাস্তায়। অথচ অরিন্দমের পা দু'টো অসম্ভব ভারী হয়ে উঠছে ক্রমশ। ও এখন চলচ্ছক্তিহীন। হঠাৎ ছ্যাঁত করে উঠল তার সর্বাঙ্গ। সুটকেস-ধরা-মুঠোর ওপর কনকনে ঠাণ্ডা একটা ছোঁয়া।

"কে!" চিৎকারে অরিন্দমের গলার শিরা ছিঁড়ে গেল যেন।

"আমি, লছা, দাদাবাবু। দিন, বাসকোটা দিন।"

লছা। বড়কর্তা, মানে দাদামশাইয়ের খাস ভৃত্য। অন্ধকারের ভেতর অন্ধকার হয়ে বসে ছিল এতক্ষণ। ধড়ে প্রাণ এল অরিন্দমের। আপাদমস্তক কালো চাদরে ঢাকা লোকটার পাশে দাঁড়িয়ে অরিন্দমের শরীর উষ্ণতা ফিরে পাচ্ছে ধীরে-ধীরে। আতঙ্কের রেশটা কাটতে খানিকটা সময় লাগছে। আড়ষ্ট কণ্ঠনালী। কথা বেরোচ্ছে না।

লছাই কথা শুরু করল, "সব্বাই ফিরে গেল, দাদাবাবু। বাস তো আর নেই। মন বলল নাহ্, দাদাবাবু আজ আসবেই। আর এসেই যদি পড়ে। তখন? কী বেপদেই না পড়বে। শীতে জমে গেছি দাদাবাবু। বয়েস তো আর কম হল না।"

অরিন্দমের বাক্যস্ফূর্তি হল এতক্ষণে, "কতকাল পরে আসছি তো! কেমন যেন অচেনা-অচেনা লাগছিল জায়গাটা। তার ওপর যা অন্ধকার! তাই একটু অস্বস্তি লাগছিল আর কী।" অরিন্দমের স্বর এখন স্বাভাবিক, "তুমি আবার এই বয়সে..এত রাত্রে..."

(এর পরে ২৮ পাতায়)

অ্যাসটেরিক্সের অভিযান

গ্ল্যাডিয়েটর অ্যাসটেরিক্স

গল্প : গোসিনি
ছবি : ইউদেরজো

গ্ল্যাডিয়েটর অ্যাসটেরিক্স

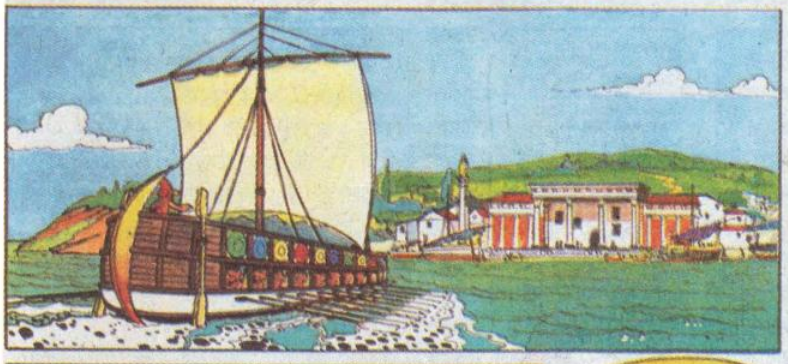

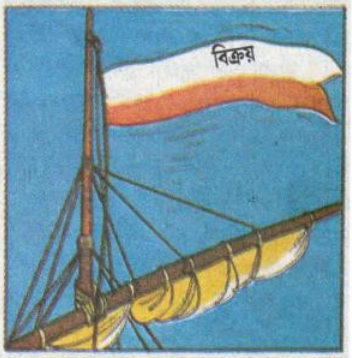

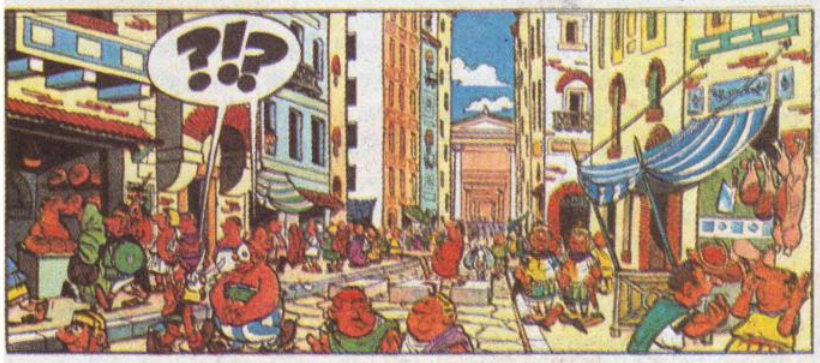

(এর পরে আগামী সংখ্যায়)

(২৫ পাতার পর)

মুখের কথা কেড়ে নিয়ে লছা বলল, "এখনকার লোকজনের আর সে-জ্ঞানগম্মি নেই দাদাবাবু। সবই দায়সারা কাজ। আরে, গাড়িঘোড়ার ব্যাপার। কোথায় কী হয় বলা যায় ! আর এসেই যদি পড়েন, তখন ? তাই মনে মনে বললাম, যা ব্যাটারা। আমিই রইলাম। তেমন হলে রাতভর থাকতাম। বয়েসটাকে বেহাল পেয়ে হিমটা একটুম....। ঝিমঝিমানি বৃষ্টিও হয়ে গেল। খানিক আগে। আর নাহ্ চলুন দাদাবাবু..."

বয়স কত হবে লছার ? অরিন্দম যখন গ্রাম ছাড়ল তখনই তো ও ষাট ছুঁই-ছুঁই। এখন, প্লাস টোয়েন্টিওয়ান,—মনে-মনে হিসেব করল অরিন্দম।

"সাবধানে হাঁটুন দাদাবাবু। খানাখন্দ সামলেসুমলে চলুন। যা আঁধার ! আমি যাচ্ছি সামনে।" বলেই লছা সামনে এগিয়ে গেল। "দেখে-দেখে আসুন আমাকে।"

কী দেখবে অরিন্দম ! ওর কালো চাদর ঢাকা অবয়ব অমাবস্যার সঙ্গে মিশে একাকার। এতক্ষণে একটা সিগারেটের প্রয়োজন হল অরিন্দমের। কনকচাঁপার কলি দপ করে লাফিয়ে উঠল লাইটারের মুখে। একলহমার জন্য দেখা গেল লছাকে। ছ' ফুট ছোঁয়া লম্বা একটা কালো অবয়ব শুধু। বয়সের ভারে এতটুকু নুয়ে পড়েনি। নিঃশব্দে চলমান একটা খুঁটি যেন।

বড় বিচিত্র জীবন এই লছার। বড়কর্তার খাস ভৃত্য। নায়েবের খাতায় সে হুঁকোবর্দার। সর্ববিদ্যায় পারঙ্গম লছা; অরিন্দমের কিশোরবেলার বিস্ময়। সে ছিল ওদের 'হিরো'। নারকেল গাছে উঠত তরতরিয়ে। কাঠ বেড়ালির মতো, বিষধর সাপ ধরত অবলীলায়, পুঁইডাঁটা ধরেছে যেন। গাছপালা, শেকড়বাকড় থেকে নানা রোগজাড়ির ওষুধ তৈরির বিদ্যে ছিল ওর। প্রায় সবরকম হাতের কাজে ওস্তাদ। কাঠের ওপর নকশা খোদাই, সোলার ফুল-পাখি তৈরি, শামিয়ানায় অ্যাপ্লিকের কাজ—আরও কত কী। লছা ছিপ ফেললে মাছ টোপ গিলবেই। কী একটা মন্তর বিড়বিড় করে, টোপটাতে এক দলা থুতু ফেলে দিত। ব্যস, ওতেই কাজ। অরিন্দম ছিল ওর ন্যাওটা। সবসময় ঘুরঘুর করত ওর পেছনে। ওইসব মন্তরটন্তর শেখার প্রবল ইচ্ছে ছিল তার। শুধু অরিন্দম কেন—বাড়ির সব ছেলের কাছেই লছার কদর, খাতির ছিল নানা কারণে। কতরকমের ঘুড়ি, পেয়ারাকাঠের গুলতি, দেওয়ালির জন্য তুবড়ি -হাওয়াই, নাটকের প্রয়োজনে রাবণের দশ মুণ্ড, গণেশের শুঁড়, শীতের সকালে খেজুর রস, ভর গ্রীষ্মে তালশাঁস, আরও অজস্র আবদার, ফরমাশের জন্য লছা একেবারে অপরিহার্য। লছার গল্পের ভাণ্ডারটি যেন রাজকোষ। যেমন বলার ভঙ্গি সেইসঙ্গে কথকতার কায়দায় মাঝে-মাঝে সুরের প্রয়োগ। একেবারে মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে শুনত শ্রোতারা। তার গল্পের আকর্ষণ অন্দরমহল পর্যন্ত। ভরদুপুরে ডাক পড়ত অন্দরমহলে। সর্বোপরি লছা অসাধারণ হরবোলা। কর্তামশাইয়ের ছিল থিয়েটারের শখ। নাটকের নেপথ্যে লছার একটা বড় ভূমিকা থাকবেই। 'হরিশচন্দ্র' পালার শ্মশান-দৃশ্যে শেয়াল শকুনের ডাক শুনে গায়ে কাঁটা দিত দর্শকদের। 'রামের বনবাস'-এ পঞ্চবটী বনের অপূর্ব এক আরণ্যক পরিবেশ সৃষ্টি করত লছা পশুপাখিদের ডাক শুনিয়ে। যে-কোনও নারী-পুরুষের কণ্ঠস্বর, চলাফেরার ভঙ্গি নিঁখুতভাবে নকল করার বিস্ময়কর ক্ষমতা ওর। সবাই ওর গুণমুগ্ধ। দীর্ঘদেহী লছা, রোদে সেঁকা গাত্রবর্ণ আর ভোজালির মতো গোঁফ। রাস উৎসবের শোভাযাত্রার সামনে চলেছে লছমন পাঁড়ে। মাথায় পাগড়ি, ঝলমলে উর্দির ওপর বড়কর্তার নাম খোদাই হুদ্দা। আর কাঁধে রুপোর সোঁটা। মেঘডাকা গলায় "হট, হট, হট যাও।"

লছা নামটার উৎস লছমন বা লক্ষ্মণ। ওর বাবা ছিলেন চৌধুরীবাড়ির দরোয়ান। নীলকণ্ঠ পাঁড়ে। আরা জেলার লোক। মাতৃহীন শিশুকে নিয়ে এসেছিল এ-বাড়িতে। আর, কিশোর লছমনকে রেখে নীলকণ্ঠ দেহরক্ষা করে।

অজস্র গুণের আকর লছার একটাই মাত্র দোষ। দ্বাররক্ষীর পুত্র হল চোর। শুধু চোর বললে ওর চৌর্যবৃত্তিকে খাটো করা হবে। কারণ, বৃত্তিটাকে সে শিল্পের পর্যায়ে তুলতে পেরেছে। তার মহৎ গুণের সমন্বয়ে গড়া এই শিল্পটি।

দাদামশাইয়ের সোনার ঘড়ি তাঁর বালিশের তলা থেকেই সরাল লছা। উনি তখন বিছানায় শুয়ে 'কাদম্বরী' পড়ছেন। মেজোমামিমার হাত থেকে অনন্তজোড়া খুলে নিল অবলীলায়। দুপুরে সবে একটু ঝিমুনি ধরেছিল তাঁর। রেড়ির তেলের প্রদীপে আলো-আঁধারি ঘরটা। সিন্দুক খোলার শব্দ। পাশ ফিরলেন বড়মামা। মামিমা কী যেন খুঁজছেন সিন্দুকে। বড়মামা জিজ্ঞেস করলেন, উত্তর এল, "মাকড়িটা নিচ্ছি ছোটবউমার।" দিনতিনেক পরে জানা গেল প্রকৃত ঘটনাটা। লছাই সিন্দুক থেকে মাকড়ি সরিয়েছে। পরেছিল মামিমার শাড়ি। আর হুবহু তাঁর গলা, বড়মামাও ধরতে পারেননি। আর নিধু বক্সির ক্যাশ বাক্স থেকে টাকাটা সিকিটা। সে তো লছার কাছে নস্যি। বক্সিমশাইয়ের পিঠে ঘামাচি মারতে-মারতে ক্যাশবাক্সে হাত চালাত লছা।

এইসব চৌর্যশিল্পের জন্য প্রায় নিত্যদিনই শাস্তি ভোগ করতে হত লছাকে। সেই করুণ দৃশ্যগুলো ভেসে আসছে অরিন্দমের মনে। লছাকে দেওয়ানখানার খুঁটিতে বেঁধে ফেলা হত প্রথমে। তারপর চলত, দাদামশাইয়ের ভাষায় লাঠ্যৌষধি। দাদামশাইয়ের সে কী রুদ্র রূপ তখন। মারতে-মারতে ক্লান্ত হয়ে পড়তেন যখন ডাক পড়ত বলরামের। ইয়া ষণ্ডামার্কা পেয়াদা। এই দ্বিতীয়পর্বটা আর দেখা যেত না। অরিন্দমের চোখে মিহি কুয়াশা জমত। লছা কিন্তু নির্বিকার। নির্বাক। দেখলে মনে হবে, লছা নয়, দেওয়ানখানার খুঁটিটাই যেন মার খাচ্ছে। সন্ধেরাতে কীসব শিকড়বাকড়ের মালিশ লাগাত সর্বাঙ্গে। আর যথারীতি রাত-ফুরানি নরম আঁধারে অম্বুরি তামাকের খুশবু ঘুম ভাঙাত বড়কর্তার। লছা তখন আলবোলার নল ধরিয়ে দিত কর্তার হাতে। ব্যাটা বুদ্ধির ঢেঁকি। ওকে তাড়ানোর-ছাড়ানোর কথা মনেই আসত না দাদামশাইয়ের। শুধু স্নেহ নয়, দাদামশাই লছার গুণের সমঝদার ছিলেন ভিতরমনে। কিন্তু প্রকাশ্যে তাঁর একটা যুক্তি ছিল প্রবল। তিনি বলতেন, "ঢেঁকি সগ্গে গেলেও ধান ভানবে। ওকে তাড়িয়ে দিলে ওর চৌর্যবৃত্তির প্রসার ঘটবে এ-বাড়ির বাইরে। বিপদ হবে এ তল্লাটের গেরস্তদের।" সত্যি-সত্যি, লছা কিন্তু চৌধুরী পরিবারের মধ্যেই সীমাবদ্ধ রেখেছিল তার কর্মকাণ্ড। জমিদারি এলাকায় লছা অবাধে বিচরণ করলে সমস্ত দায়ঝক্কি এসে পড়ত তাঁরই ওপর।

লছাকে মারধরটা অবশ্য বড়কর্তার তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়া। কিন্তু এতদিনের অভিজ্ঞতায় বাড়ির সবাই জানতেন, হারানো সোনাদানা একদিন-না-একদিন ফিরে আসবে যথাস্থানে। ঠিক তাই। অপহরণের মতোই নিখুঁত কায়দায় চোরাই জিনিস ফিরিয়ে দিত লছা। ঘুণাক্ষরে টের পেতেন না কেউ। নিধু বক্সির ক্যাশ বাক্সের পয়সাকড়ি তুচ্ছজ্ঞানেই হয়তো ফেরত দেওয়ার কথা মনে হত না লছার।

নিমজা গাঁয়ের কাছাকাছি এসে পড়েছে অরিন্দম। এখানে কাঁটা বাঁশের জঙ্গল ঝুঁকে পড়েছে রাস্তার ওপর। ঘোমটার মতো বাঁশবনের কাছে আসতেই হঠাৎ আঁতকে উঠল অরিন্দম। একেবারে গায়ের কাছেই শেয়ালের ডাক। লছাকে জড়িয়ে ধরার জন্য লাফ দিল একটা। সেই মুহূর্তে খানিকটা দূর থেকে লছার ফ্যাঁচ ফ্যাঁচ হাসি শোনা গেল।

"জন্তুজানোয়ার নয় গো, আমি গো দাদাবাবু—

আমি। দেখছিলাম, মনে আছে কিনা লছাকে।" পরক্ষণেই একটা কালপেঁচার ডাক অন্ধকার চিরে ভেসে গেল। শিরশির করে উঠল অরিন্দমের গা-টা। আবার সেই ফ্যাঁচ ফ্যাঁচ হাসি। "কী গো দাদাবাবু, মনে পড়ছে ? কত বচ্ছর বাদে।"

রাস মঞ্চের কাছে এসে পড়েছে অরিন্দম। সামনে চৌতারার ওপর বৃদ্ধপ্রপিতামহের মতো প্রাচীন অশ্বত্থ। এখানে লোকেরা ছবুতরকে বলে চৌতারা। ওইখানে বাঁক নিতেই দেখা গেল আকাশপটে মন্দিরের চূড়া। আলো ছুঁয়েছে চূড়ার কলসে। তার মানে প্রাক্-উৎসবের উজাগর রাত এখন চৌধুরীবাড়িতে।

সদর দেউড়িতে পা দিতেই মুখর জলসাঘরের সেই পরিচিত সুর কানে এল। অন্দরমহলের দিকে পা বাড়াতে গিয়ে থমকে দাঁড়াল অরিন্দম। বলল, "না, তুমি যাও ভেতরে। আমি জলসাঘরেই যাচ্ছি। সবাই তো এখন ওইখানে।"

দু'পা এগিয়ে আবার ফিরে এল লছা। অরিন্দমের হাতে সুটকেসটা ধরিয়ে দিয়ে বলল, "এটা এখন আমার আর দরকার নেই দাদাবাবু। আপনি ধরুন।" বলেই সেই ফ্যাঁচ ফ্যাঁচ হাসি। দক্ষিণের দরজা দিয়ে অদৃশ্য হয়ে গেল সে।

হঠাৎ সেতার-এসরাজের যুগলবন্দি থেমে গেল, মাঝপথে। কুলু-বুলু-ডুলু পরিবেষ্টিত অরিন্দম। "এসে গেছে, অরু এসে গেছে।"

মামারাও বেরিয়ে এলেন একে-একে। সবাই অবাক ! মেজোমামা বললেন, "এত রাতে ! কী করে এলি তুই ! লাস্ট বাস দেখেই লোকজন তো ফিরে এল।"

"আর বোলো না। ট্রেন লেট। বাস ব্রেক ডাউন। উঃ, সে কী ভজঘট কাণ্ড।"

মানুদা বললেন, "এই অন্ধকারে, একা-একা ! আসতে পারলি তুই ?"

"একা কেন ? লছা তো ঠায় বসেই ছিল তেমাথানির মোড়ে। বৃষ্টিতেও ভিজেছে বেচারা।"

"কে ? কে বসেছিল !" সমস্বরে প্রশ্ন।

"লছা আবার কে ? একাই বসেছিল বটতলায়। তা নইলে..."

ডুলু-বুলুদের সামনে হাড় কাঁপানো আতঙ্কের কথাটা চেপেই যেতে হল। "তা নইলে খানিকটা অসুবিধে হত বইকী ! যা অন্ধকার..."

সবাই থম মেরে গেছে। হঠাৎ বড়মামা হো-হো করে হেসে উঠলেন। "তুই ভুল দেখেছিস অরু। লছা তো..."

"কী বলছ ? লছাকে চিনব না আমি। শেয়ালের ডাক। পেঁচার চেঁচানি সারাটা পথ আমাকে ভয় দেখাতে-দেখাতে এনেছে। ঠিক সেই আগেরই মতো।"

"আবার লছা। সে তো মারা গেছে বছরসাতেক।" টুনুদা বললেন। তাঁর গলা কলাপাতার মতো কাঁপছে, "রাম... রাম... রা-ম।"

কেষ্ট বলল, "শুধু 'রাম-রাম' নয় দাদা। লছমন-লছমন বলুন।"

মানুদা ঠায় দাঁড়িয়ে ছিলেন চুপটি করে। উত্তেজনার স্রোতে ভেসে যাওয়া তাঁর স্বভাব নয়। এতক্ষণে তাঁর ভারী গলা শোনা গেল, "বেশ তো লছাকে তুই চিনেছিস, ধরেই নিলাম। কিন্তু কোথায় গেল সে ?"

কথা শুকিয়ে দলা পাকিয়ে আছে অরিন্দমের গলায়। ব্যাপারটা আর হাসিঠাট্টা মনে হচ্ছে না তার। জলসাঘর ফাঁকা। একটা ভিড় জমেছে উঠোনে,তাকে ঘিরে। বড়-ছোট সবাই মিলে পরিহাস করছে না নিশ্চয়। নিভন্ত বাতির মতো তার কণ্ঠস্বর শোনা গেল, "এই তো, বাড়ির ভেতর চলে গেল। আমার হাতে সুটকেসটা ধরিয়ে দিয়ে বলল— এখন এটা আমার আর দরকার নেই।"

লছার শেষ কথাটা মনে পড়তেই ওর ফ্যাঁচ ফ্যাঁচ হাসি যেন অরিন্দমের বুকে দাঁত বসাল আবার।

মানুদা বললেন, "ইয়েস, লছা। আই অ্যাম শিওর। মার্ক ইট, সুটকেস ফেরত দিয়ে কী বলেছে, এটা আমার এখন দরকার নেই..."

অরিন্দমের মুঠো শক্ত হল সুটকেসের হাতলে। ওটার ভেতর নেকলেস আর বেনারসি আছে টুসির জন্য।

জলসাঘরের হ্যাজাক বাতিটা হঠাৎ দপ-দপ করে নিভে গেল। একটা লোমশ অন্ধকার পরিবেশটাকে ঘিরে ফেলল তৎক্ষণাৎ।

সাত বছর পরে ফিরে এসেছে লছা। কালো কম্বলে ঢাকা চৌধুরীবাড়ির ওপর চক্কর খাচ্ছে রাত-চেরা পেঁচার ডাক।

ছবি : কৃষ্ণেন্দু চাকী

অ্যান, আমার কথা শুনতে পাচ্ছ ?
পাচ্ছি। ডায়না, আমরা মুটি দ্বীপের কাছে পৌঁছে গেছি।

বড় দ্বীপের লোকেরা হাত নেড়ে বলছে, আমরা যেন ফিরে যাই। ওদের এখান থেকে দেখতে পাচ্ছি।
জঙ্গলের মানুষরা মনে করে, মুটি দ্বীপে যাওয়া বারণ।

অ্যান ও তার স্বামী ডঃ লেস্‌লি দু'জনেই বিজ্ঞানী। ওরা এখন মুটি দ্বীপের কাছে।
দ্বীপটা স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি। কিন্তু ধোঁয়া উঠছে কেন ? শস্যখেতে আগুন, না অন্য কিছু ?

আমার স্বামী তোমার সঙ্গে কথা বলবে।
পঁচাত্তর বছর ওই দ্বীপে কেউ যায়নি। হয়তো বাজ পড়েই ওখানে আগুন লেগেছে।

ওদিকে ঝড় আসছে। হাওয়ার গতি প্রচণ্ড।
টাইফুন !

তাড়াতাড়ি নেমে পড়ো। নিরক্ষ অঞ্চলে ঝড়ের গতি প্রচণ্ড।

খুব দেরি হয়ে গেল। ঝড়ের ধাক্কায়..
দ্বীপে আছড়ে পড়ছি... নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলেছি...

নিয়ন্ত্রণ নেই... পড়ে যাচ্ছি... বাঁচাও
দুম

(এর পরে ৫৫ পাতায়)

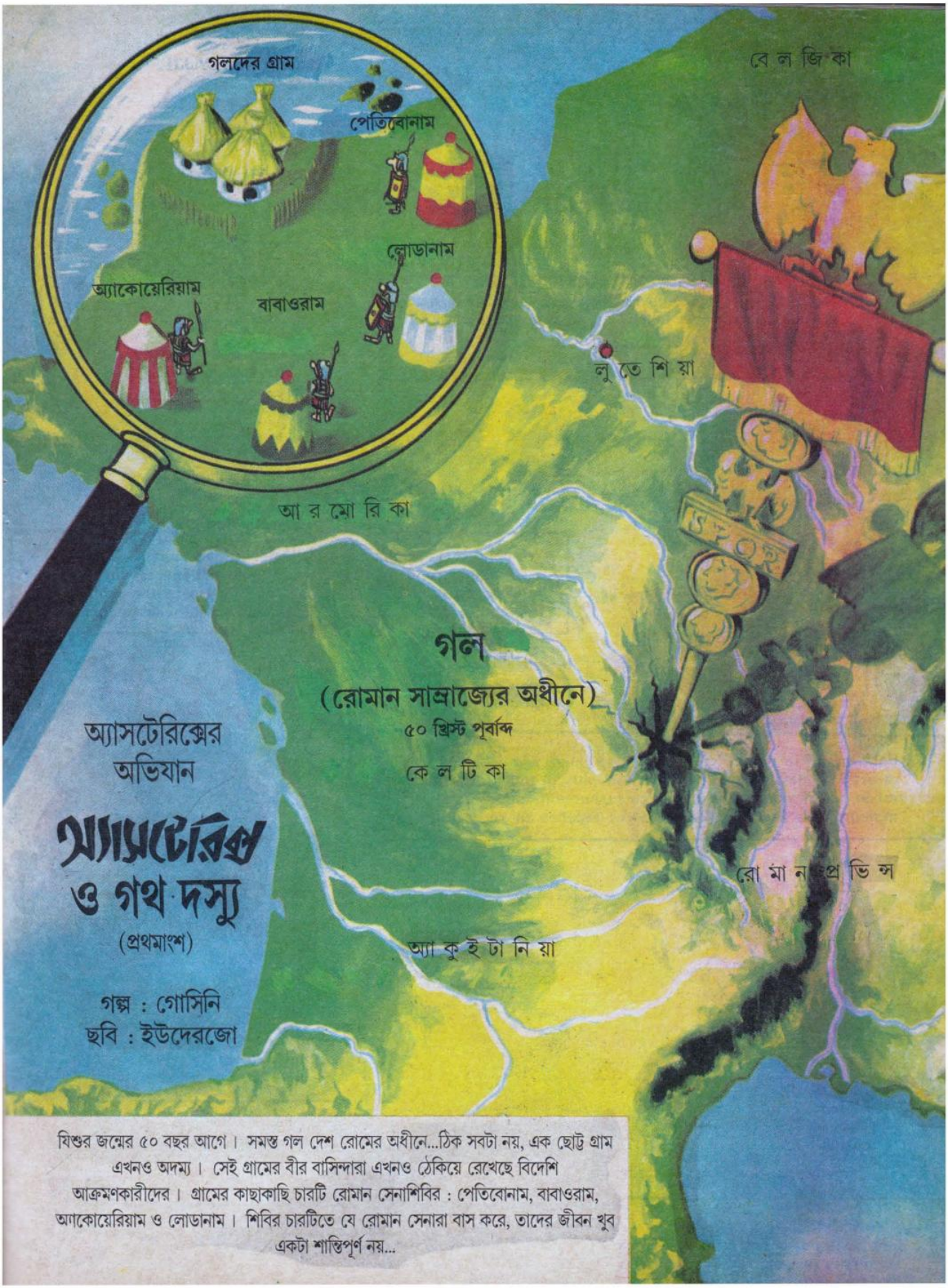

যিশুর জন্মের ৫০ বছর আগে। সমস্ত গল দেশ রোমের অধীনে...ঠিক সবটা নয়, এক ছোট্ট গ্রাম এখনও অদম্য। সেই গ্রামের বীর বাসিন্দারা এখনও ঠেকিয়ে রেখেছে বিদেশি আক্রমণকারীদের। গ্রামের কাছাকাছি চারটি রোমান সেনাশিবির : পেতিবোনাম, বাবাওরাম, অ্যাকোয়েরিয়াম ও লোডানাম। শিবির চারটিতে যে রোমান সেনারা বাস করে, তাদের জীবন খুব একটা শান্তিপূর্ণ নয়...

গলের কয়েকজন অধিবাসী

অ্যাসটেরিক্স, এই রোমাঞ্চকর গল্পগুলির নায়ক। এই ছোটখাটো যোদ্ধার যেমন বুদ্ধি, তেমনই সাহস। বিপজ্জনক সব কাজের দায়িত্বই ওকে নির্দ্বিধায় দেওয়া যায়। অ্যাসটেরিক্সের আছে অতিমানবিক শক্তি, যার উৎস পুরোহিত এটাসেটামিক্সের জাদু-পানীয়ের পাত্র...

ওবেলিক্স, অ্যাসটেরিক্সের প্রাণের বন্ধু। 'মেনহির' নামে এক ধরনের স্মারকশিলা বাড়ি বাড়ি পৌঁছে দেওয়া এর পেশা, বুনো শুয়োরের 'রোস্ট' খাওয়া এর নেশা। যে কোনও সময় সব কাজ ফেলে ওবেলিক্স বেরোতে পারে বন্ধুর সঙ্গে নতুন অভিযানে, শুধু চাই বুনো শুয়োরের রোস্ট ও শত্রুকে উত্তমমধ্যম দেওয়ার সুযোগ...

এটাসেটামিক্স। গ্রামের খুব মান্য পুরোহিত। গাছগাছড়া থেকে তৈরি করেন নানারকম পানীয়। এর মধ্যে শ্রেষ্ঠ হচ্ছে তাঁর নিজস্ব এক জাদু-শরবত। গলায় ঢাললে শরীরে আসে অতিমানবিক শক্তি। এ ছাড়াও এটাসেটামিক্স জানেন নানা রকম গোপন কৌশল....

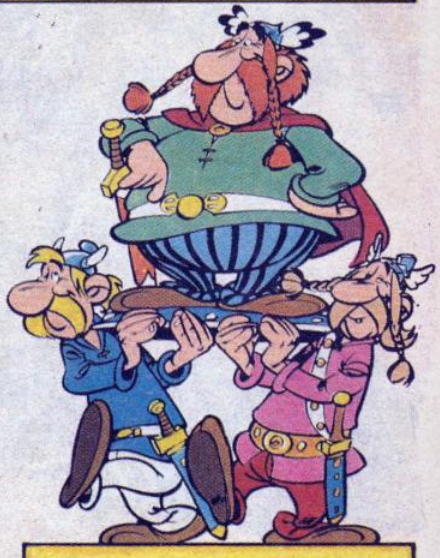

এবং বিশালাকৃতিক্স। গ্রামের মহামান্য প্রধান। রাজসিক, সাহসী, রগ চটা ও অভিজ্ঞ যোদ্ধা। প্রজারা যেমন শ্রদ্ধা করে, শত্রুরা তেমনই ভয় করে। এঁর একটাই ভয়, আগামীকাল মাথায় না আকাশ ভেঙে পড়ে....তবে নিজেই আবার বলেন, 'আগামীকাল কখনও আসে না।'

কলরবিক্স। চারণকবি। এঁর সঙ্গীতপ্রতিভা সম্বন্ধে নানাজনের নানা মত। এঁর নিজের বিশ্বাস, ইনি অসামান্য প্রতিভাবান। অন্যেরা ভাবে ঠিক উলটো। অবশ্য গান টান না গাইলে, কিংবা মুখ না খুললে এঁর মত বন্ধু কমই আছে...

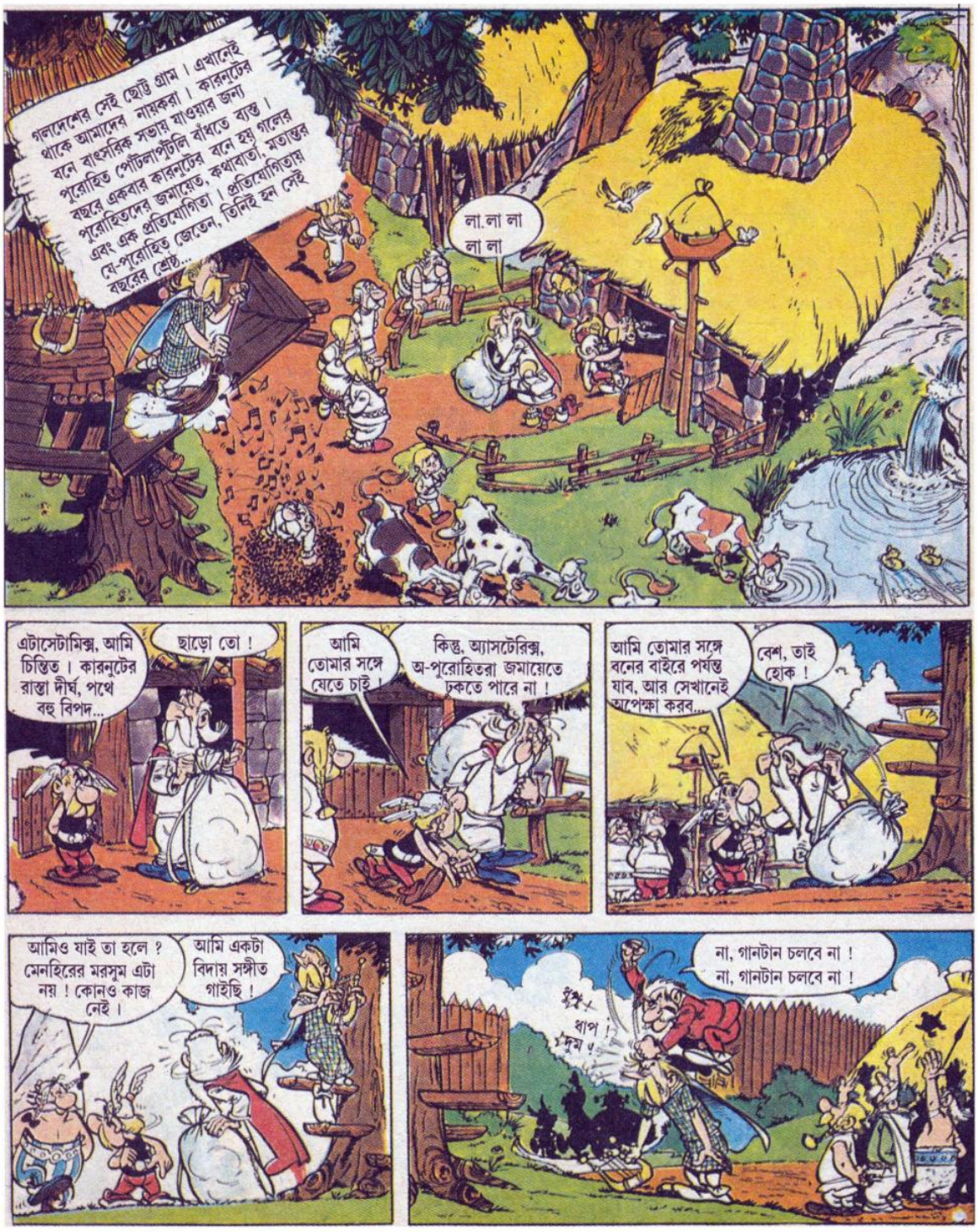

গলদেশের সেই ছোট্ট গ্রাম। এখানেই থাকে আমাদের নায়করা। কারনুটের বনে বাৎসরিক সভায় যাওয়ার জন্য পুরোহিত পোঁটলাপুঁটলি বাঁধতে ব্যস্ত। বছরে একবার কারনুটের বনে হয় গলের পুরোহিতদের জমায়েত, কথাবার্তা, মতান্তর এবং এক প্রতিযোগিতা। প্রতিযোগিতায় যে-পুরোহিত জেতেন, তিনিই হন সেই বছরের শ্রেষ্ঠ...
লা.লা লা লা লা
এটাসেটামিক্স, আমি চিন্তিত। কারনুটের রাস্তা দীর্ঘ, পথে বহু বিপদ...
ছাড়ো তো !
আমি তোমার সঙ্গে যেতে চাই !
কিন্তু, অ্যাসটেরিক্স, অ-পুরোহিতরা জমায়েতে ঢুকতে পারে না !
আমি তোমার সঙ্গে বনের বাইরে পর্যন্ত যাব, আর সেখানেই অপেক্ষা করব...
বেশ, তাই হোক !
আমিও যাই তা হলে ? মেনহিরের মরসুম এটা নয় ! কোনও কাজ নেই।
আমি একটা বিদায় সঙ্গীত গাইছি !
না, গানটান চলবে না !
না, গানটান চলবে না !
ধাপ !
দুম !

অনেক দূরে, গলের সীমানার কাছে, দু'জন রোমান সৈনিক পাহারা দিচ্ছে...
তিন গোনা শেষ হলে !
?
সীমানা রোমান রাজ্য শুরু
অ্যাই ! কেউ যেন গথিক ভাষায় কথা বলল !
!?
দিনে স্বপ্ন দেখছিস নাকি !
ঠিকই বলছি ! বিশ্বাস কর !
ভিসিগথ, অস্ট্রোগথ বা অন্য গথ,— যেই হোক, রোমান সাম্রাজ্যে পা দেওয়ার ক্ষমতা কারও নেই !
তিন ! ... আক্রমণ ! ...
!
!?
বদাম
ধুপ
গদাম
ঢিসুম
কী বলেছিলুম ?
মানুষমাত্রেই ভুল করে !
শাবাশ ! দারুণ কাজ ! এবার কারনুটের বনের দিকে চলো...
দলপতি গুঁতোরসিক জিন্দাবাদ !

সীমানার কাছে যখন এই ধুন্ধুমার কাণ্ড চলছে, তখন আমাদের বন্ধুরা কারনুটের পথে...
কিছুক্ষণের মধ্যেই পৌঁছব, সবকিছু তো ঠিকঠাকই চলছে।
হ্যাঁ, এখন পর্যন্ত...
খিদে পেয়েছে...
ওহো! আশ্চর্য!
বুনো শূকর বুঝি!
বন্ধুরা, আলাপ করিয়ে দিই। আমার পুরনো বন্ধু ও সহকর্মী— বেলজিয়ামের পুরোহিত উনিশবিক্স।
আলাপ করে সুখী হলুম।
দেখো, তোমাকে আমার নতুন আবিষ্কার দেখিয়ে অবাক করে দেব
আমিও...
দাঁড়াও!
রোমান সেনাদল!
পেটাই এদের?
না, ওবেলিক্স! কারনুটের সভার সময়টুকুর জন্য রোমানদের সঙ্গে শান্তিচুক্তি চলছে।
আমাদের যেতে দিন, সেনাপতি। আমরা পুরোহিত, কারনুটের বনে যাচ্ছি।
জুপিটারের নামে, আমি বিশ্বাস করতে চাই। তবে প্রমাণ দিতে হবে!

কী প্রমাণ ? সত্যি পুরোহিত কি না ? সে খুব সোজা। কয়েকটা জাদু দেখাচ্ছি...
আমি দেখাচ্ছি, এটাসেটোমিক্স !
বেশ...
একজন স্বেচ্ছাসেবক চাই...
সৈনিক, তুমি যাও !
?
এটা খেয়ে ফেলুন...
কচমচ কচমচ
ব্যস, জাদু কোথায় ?
ওকে কথা বলতে বলুন দেখি...
কথা বলো !
ঘ্যাঁ ঘোঁ !
হি ! হি ! ও আর কথা বলবে না ! গাধার ডাক ডাকবে !
তাতে ওর বিশেষ কিছু পরিবর্তন হবে না !
?
হা ! হা ! হা !
হা ! হা ! হা !
যাও, তোমরা আসল পুরোহিত। আমরা একটু কড়াকড়ি করছি কারণ গথ দস্যু সীমানা পেরিয়ে রাজ্যে ঢুকেছে সকলকে সতর্ক করা হচ্ছে।
ঘ্যাঁ ঘোঁ !
চুপ ! আগে চলো !

দেখলে, সঙ্গে এসে ঠিকই করেছি, পুরোহিত ! একদল বর্বর ঘোরাফেরা করছে।
দুর ! রোমানদের সঙ্গে বর্বরদের শত্রুতা, তাতে আমাদের কী ?
কারনুটের অরণ্য
অ-পুরোহিতদের প্রবেশ নিষেধ
উফ, পৌঁছেছি !
পুনর্মিলন উৎসবশেষ না হওয়া পর্যন্ত থাকব।
বেশ !
প্রতিযোগিতার জন্য শুভেচ্ছা রইল !
একটু আগুন জ্বালাই।
বর্বররা এখানে কী করছে কে জানে !
ভালই সময় কাটবে মনে হচ্ছে। এখানে অনেক বুনো শুকর...
এদিকে, কাছেই...
বন্ধুগণ, তোমরা জানো আমরা এখানে কেন এসেছি...
গলের শ্রেষ্ঠ পুরোহিতকে অপহরণ করতে। তাকে আমরা নিজেদের রাজ্যে নিয়ে যাব ও তার জাদুশক্তির সাহায্যে রোমান দেশ জয় করব...
ভিসিগথ, অস্ট্রোগথ এবং অন্য গথেরা এতে গৌরবান্বিত হবে !
গুঁতোরসিক জিন্দাবাদ !!!
চুপ ! এবার প্রতিযোগিতা দেখে শ্রেষ্ঠ পুরোহিতকে ধরে নিয়ে যেতে হবে !
জানো উনিশবিক্স, আমি নিশ্চিত যে, আমিই বছরের সেরা পুরোহিত নির্বাচিত হব !
5

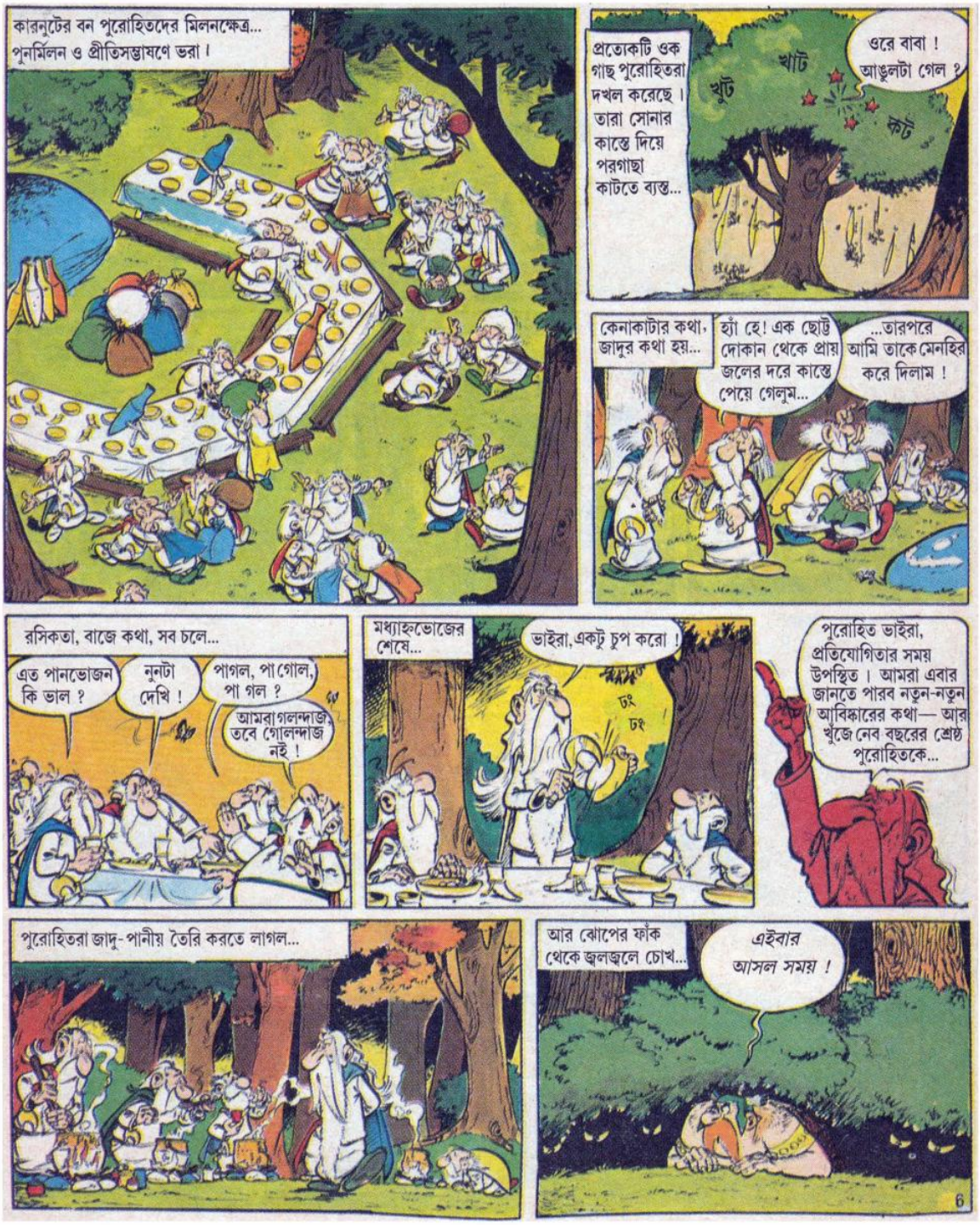
কারনুটের বন পুরোহিতদের মিলনক্ষেত্র...
পুনর্মিলন ও প্রীতিসম্ভাষণে ভরা।
প্রত্যেকটি ওক গাছ পুরোহিতরা দখল করেছে। তারা সোনার কাস্তে দিয়ে পরগাছা কাটতে ব্যস্ত...
খাট
খুট
কট
ওরে বাবা! আঙুলটা গেল?
কেনাকাটার কথা, জাদুর কথা হয়...
হ্যাঁ হে! এক ছোট্ট দোকান থেকে প্রায় জলের দরে কাস্তে পেয়ে গেলুম...
...তারপরে আমি তাকে মেনহির করে দিলাম!
রসিকতা, বাজে কথা, সব চলে...
এত পানভোজন কি ভাল?
নুনটা দেখি!
পাগল, পা গোল, পা গল?
আমরা গলন্দাজ, তবে গোলন্দাজ নই!
মধ্যাহ্নভোজের শেষে...
ভাইরা, একটু চুপ করো!
ঢং
ঢং
পুরোহিত ভাইরা, প্রতিযোগিতার সময় উপস্থিত। আমরা এবার জানতে পারব নতুন-নতুন আবিষ্কারের কথা— আর খুঁজে নেব বছরের শ্রেষ্ঠ পুরোহিতকে...
পুরোহিতরা জাদু-পানীয় তৈরি করতে লাগল...
আর ঝোপের ফাঁক থেকে জ্বলজ্বলে চোখ...
এইবার আসল সময়!

প্রথম প্রতিযোগী... পুরোহিত সাইট্রিক্স !
আমার তৈরি মিশ্রণের কয়েক ফোঁটা মাটিতে ফেললুম...
আর, এই দেখুন, মরসুম না হলেও ফুটে উঠছে ফুল...
অতি সুন্দর !
তালি ! তালি !
আহা !
তালি ! তালি !
চুপ ! গাধা !!
তালি ! তালি !
কী হল ? বর্বর বলে আমরা ফুল ভালবাসতে পারি না ?
হুমমম
দ্বিতীয় প্রতিযোগী... পুরোহিত বৃষ্টিক্স ।
এই আমি এক চিমটি গুঁড়ো বাতাসে ছুড়ে দিলাম...
আর ঝমঝমিয়ে নামল বৃষ্টি !
মজার ব্যাপার !
অথচ এখন বর্ষাকাল নয় !
পুরোহিত ব্যারোমেট্রিক্স !
হ্যাঁচ্চো !
আমি এমন এক উপায় আবিষ্কার করেছি যাতে সুপকে গুঁড়ো করে কাগজের ঠোঙায় বহন করা যায় । পাত্র-টাত্র লাগবে না...
কিন্তু সুপ খেতে গেলে তো পাত্র লাগবেই ।
তাও ভেবেছি !
আর পাত্রটিকে গুঁড়োর আকার দেওয়ার উপায় খুঁজে বের করেছি !
শাবাশ !
কী বুদ্ধি !
বেশ তো !
তালি !
আলি !
প্রতিযোগিতা শুরু হয়েছে, মনে হয় সবাই খুশি !
দেখো, আমি জানি আমাদের পুরোহিতই সবার সেরা নির্বাচিত হবে !
শাবাশ ! আলি ! ব্রাভো !

এর পর আসবেন পুরোহিত উনিশবিক্স
আমি এমন এক মিশ্রণ আবিষ্কার করেছি, যাতে শরীরের দুঃখকষ্ট বোঝা যায় না। দেখুন...
ঢক
ঢক
ঢক
আমি ফুটন্ত জলে হাত দিতে পারি...
অদ্ভুত !
তালি !
তালি !
তালি !
অসাধারণ
এবং শেষ প্রতিযোগী... এটাসেটামিক্স !
আমার জাদু-পানীয় অলৌকিক শক্তি দেয়...
একজন দুর্বল পুরোহিত এগিয়ে আসুন !
আমি আসছি।
এটা পান করুন, তারপর ওই ওকগাছটি উপড়ে ফেলুন...
এইটা ?
ইইইই !
ওও !
ক্র্যাক !
পাগল নাকি ?
এ কী ? আমরা পরগাছা কাটছিলুম !
আমি আগেই তোমার জাদু-পানীয়ের কথা শুনেছি, এটাসেটামিক্স। কিন্তু যা শুনেছি তার চেয়েও চমকপ্রদ !
আমার কাজ শেষ ?
হুররে ! ইনিই বিজয়ী !
আমরা একেই ধরব।

আমি এটাসেটামিক্সকে বছরের সেরা পুরোহিত ঘোষণা করে সোনার মেনহির দিলাম !
আমি গর্বিত !
শা বা শ !
শা বা শ !
অভিনন্দন !
এ আমি আশাই করিনি !
পুনর্মিলন উৎসব শেষ । আমরা এবার একসঙ্গে বাড়ি ফিরব ।
নিশ্চয়, উনিশবিক্স ! জিনিসপত্র নিয়ে আসি !
আমি শ্রেষ্ঠ ! আমি শ্রেষ্ঠ !
তৈরি ?
তৈরি!!!
হে-এ-এ
!
এবার পালাই !!
উম্‌মম !
তখন বনের মধ্যে...
এটাসেটামিক্স গেল কোথায় ?
জমায়েত শেষ হয়েছে অনেকক্ষণ, কিন্তু পুরোহিত এটাসেটামিক্সের দেখা নেই ।
দেখলে ? মনে হচ্ছে সে-ই প্রতিযোগিতায় জিতেছে ?
চিন্তা হচ্ছে... ওবেলিক্স, চলো ওকে খুঁজি !

আহা ! এই যে তোমরা ! আমি চিন্তিত... এটাসেটামিক্স যেন গায়েব হয়ে গেছে !
ওখান দিয়ে গেল...
দেখি তো !
এ কী ! দ্যাখো !
ভিসিগথদের হেলমেট ! কী দুর্ভাগ্য ! আর আমার বন্ধুকে দেখতে পাব না !
নিশ্চয় পাব ! ওকে আমরা বর্বরদের হাত থেকে ছিনিয়ে আনব !
বর্বর ? তখন যে বললে ভিসিগথ ?
শাবাশ ! আমি তোমাদের সঙ্গে যাব !
ধন্যবাদ ! কিন্তু এ কাজের জন্য আমরা দু'জনই যথেষ্ট !
শুধু আমাকে সেই পাত্রটা দেখাও তো, যাতে জাদু-পানীয় তৈরি হয়েছিল !
এই তো সেটা !
ঢক ! ঢক !
ভাগ্য তোমাদের সহায় হোক !
আর এবার ? কোথায় যেতে হবে ?
সীমানার দিকে । পূর্ব দিকের সীমা পেরিয়ে ভিসিগথদের রাজ্যে ।
ভিসিগথরা পূর্ব দিকের গথ ?
না, ওরা পশ্চিম দিকের গথ । পূর্ব দিকের গথ হল অস্ট্রোগথ গোষ্ঠী । কিন্তু পশ্চিম দিকের গথরা পূর্ব দিকে থাকে । বুঝেছ ?
না !

পায়ের ছাপ খোঁজো, ওবেলিক্স !
কার পায়ের ছাপ, অ্যাসটেরিক্স ?
দাঁড়াও !
এই যে রোমান সৈন্যরা !
!
আমাদের যেতে দাও, তাড়া আছে !
আমরা একদল গথকে খুঁজছি।
হিহি ! আমরাও খুঁজছি। পশ্চিমের গথ যারা পুব দিকে থাকে...
?!
ভিসিগথ হেলমেট !! সেই গথ দস্যুদল !
কে? আমরা ?
একদল ? কিন্তু এরা তো দু'জন !
মারব ?
মারো !
পাফ
ভাগ্যিস, জাদু-পানীয় খেয়েছিলাম !
ওরে রোমান ! কিছু কর ! বাধা দে !
পরে...
ঠিকই বলেছিলে দলপতি ! এরাই একদল বটে !

সব গোলমাল হয়ে গেল। সময় নষ্ট তো হলই, তার ওপর রোমানরা এবার আমাদের ধরার চেষ্টা করবে।
কাছেই এক রোমান ক্যাম্পে সেনাপতি চিন্তাগ্রাস পায়চারি করছেন...
হে জুপিটার! বর্বররা এভাবে রোমান সাম্রাজ্যের সীমানার মধ্যে ঘোরাফেরা করে, ভাবা যায় না! জুলিয়াস সিজার জানতে পারলে সক্কলকে সার্কাসের সিংহের খাদ্য করবেন... !!
সেলাম সেনাপতি! পাহারাদাররা ফিরেছে।
তাদের প্রধানকে নিয়ে এসো।
সেলাম হুজুর! আমরা সেই গথ দস্যুদের খুঁজে পেয়েছি কিন্তু গ্রেফতার করতে পারিনি।
ক'জন ছিল দলে?
একটা বেঁটে, একটা মোটা!
আমি ছবি এঁকে দেখাচ্ছি!
এই ছবির কপি প্রহরীদের পৌঁছে দাও!
ওই দুই গলকে ধরতেই হবে।
ধরবই হুজুর। আর খুব শিগ্‌গিরই।
সংবাদদাতারা চারদিকে ছড়িয়ে গেল...
?
একটু পরে...
কেউ আসছে...
ওই গাছে চড়ি।

রোমান সৈন্য !
কী করতে হবে ?
ওকে ধরব। দেখতে চাই ও কোথায় যাচ্ছে।
বেশ !
বুড়ুম !
আমাদের ছবি...
হি ! হি ! কী মজা !
তাইতো ! তবে কম মজার ব্যাপারটা ছবির তলায় লেখা আছে। "এই দুই গথকে মৃত বা জীবিত চাই। দারুণ পুরস্কার।"
বোকাগুলো আমাদের তাড়া করছে। ওই গথগুলোর বদলে।
হ্যাঁ, পূর্ব দিকের গথদের বদলে আমাদের পেছনে আমরা পশ্চিমের গল। মনে হয় উত্তর দিকের হদিস হারিয়েছে !!
সারা বনে চলল এক বিশাল ঝামেলা...কিন্তু একমাত্র গথদের এসব স্পর্শ করল না।
কিচ্ছু বুঝতে পারছি না

গাছে উঠি। একদল রোমান ঘোরাঘুরি করছে।
ঠিক!
একটা বুদ্ধি মাথায় এসেছে! আমরা রোমান সাজি!
দারুণ মতলব!
ভাল করে দ্যাখো, আমাদের মতো দু'জনকে খুঁজতে হবে।
একটা বেঁটে আর একটা মাঝারি!
এই হল সুযোগ! গথ দুটোকে যদি ধরতে পারি...
দেবতারা যদি ওদের সঙ্গে একবার দেখা করিয়ে দেন...
!!
তুতের নামে!
বেলেনোস!
দুম!
দাম!
ধাঁই!
বুম!
অ্যাসটেরিক্স, এ লড়াই করতে চায় না..
ছেড়ে দাও। এখন রসিকতার সময় নয়।
মোটাটার জামা আমি নিচ্ছি। তুমি রোগাটার নাও।
তোমার কী বুদ্ধি!
আমাদের জামাগুলোও সঙ্গে নিয়ে যাব।
ভালই দেখাচ্ছে।

মনে রেখো ওবেলিক্স, রোমানদের সঙ্গে দেখা হলে তোমার নাম ওবেলাস। আমার অ্যাসটেরাস। 'আভে' আর 'জুপিটারের নামে' বলবে...
কী মজা!
সাবধান, সেনারা আসছে।
হি হি হি
আভে বন্ধুগণ! গথদের খুঁজে পেয়েছ?
আভে...জুপিটার... হি হি হি
হা হা হা হো হো!
?
মাফ করবেন, আমার বন্ধু দারুণ রসিক!
হা হা হা হো হো!
দু'জন বিপজ্জনক গথের কথা শুনে ওর হাসি পাচ্ছে?
এবার যাই।
হো হো হো হা হা
ওদের চুল-দাড়ি দেখলে?
হ্যাঁ। ওরা নিয়ম মানছে না। সেনাপতির নজরে পড়লে বিপদে পড়বে।
ওহ!
কী হল?
!
হমমম
হুমমম

দ্যাখো ! বেঁটে আর মোটা ! এরা গথ !
এরা গথ ?
হুম্‌ম ? ম্‌ম্‌ম্‌ম্‌ম্‌ম্‌
বুঝেছি ! কেউ এদের বেঁধে রেখেছে আর লোক ডাকতে গেছে...
এরাই গথ ?
আমরা এবার এদের শিবিরে নিয়ে যাব...
আর পুরস্কার আমরাই পাব !
হুম্‌ম !
আমরা ঠিক সৎ নই, না ?
হুম্‌ম্‌ম্‌ম্‌ম্‌ম্‌ম্‌
তাই তো মনে হয়...
তখন...
তাড়াতাড়ি চলো ! আমরা ধরা না পড়ে যাই...
এবার হেঁচকি উঠছে...হিক...
এদিকে গথেরা বারবার অবাক হচ্ছে...
তোমরা এদের দু'জনকে দেখেছ নাকি ?
ইতিমধ্যে...
শিবিরে পৌঁছে গেছি !
সেনাপতি খুব খুশি হবেন !
সেলাম সেনাপতি ! দু'জন সৈনিক দেখা করতে চায় । তারা গথ বন্দিদের এনেছে ।
আসতে বলো ! আমি তো দারুণ খুশি হলাম !

সেলাম !
সেলাম !
সেলাম, সাহসী যোদ্ধারা ! তোমরা গথদের বন্দি করেছ ?
এই যে তারা !
এই কাজের জন্য তোমরা সার্কাসের খেলা দেখতে ছুটি পাবে !
এবার এদের সওয়াল করা যাক !
হে জুপিটার ! রসিকতা এখনও কি শেষ হয়নি ?
?!
অদ্ভুত ! আমি গথ ভাষা বুঝতে পারছি ! শিখলুম কবে ?
কিন্তু... তোমরা কে ?
তৃতীয় দলভুক্ত দুই সৈনিক !
কে ? কী ? কেন ? আমরা কি ভুল করলাম... !!!
আমাদের চেয়ে দলে ভারী দু'জন গথের হাতে আমরা বন্দি হই ।
তারাই আমাদের জামাকাপড় নিয়েছে ।
গথেরা রোমান সেজেছে !! ওদের ধরা হোক !
হুজুর, এবার সার্কাস দেখার অনুমতি...
অবশ্যই, দারুণ জায়গায় বসে সার্কাস দেখবে...
...মঞ্চের মাঝখানে সিংহের সঙ্গে !

সেই মুহূর্ত থেকে সারা দেশে সাঙ্ঘাতিক গোলমাল লেগে গেল। কারণ প্রত্যেক রোমানই ভাবছিল অন্য রোমানরা গথ...
চল, গথ !
পাগল নাকি ?
আমি রোমান ! আমি রোমান !
ধরেছি, বর্বর কোথাকার !
সেনাপতি একেবারে ভেঙে পড়লেন...
প্রত্যেকেই আস্ত গাধা, আমি তাদের প্রধান !
অবশ্য, কয়েকজনের এতে সুবিধেই হল ! যেমন অ্যাসটেরিক্স ও ওবেলিক্স।... তারা আগের চেহারায় ফিরে গেছে...
এবং গথেরা গণ্ডগোলের মধ্যেও তারা নিশ্চিন্তে সীমানার দিকে এগোচ্ছে...
সাবধান ! সীমানা ! পেরোতে হবে...
সীমানা রক্ষা করা এক গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব...
গল রোমান সাম্রাজ্য
জার্মানি
আ হেম !
হুঁ ?
বং !
বিজয় ! দেশে তো আমরা দেবতার সম্মান পাব !
কিছু দেখানোর আছে ?

অবশ্যই ; এক পুরোহিত !
মোড়ক খোলো !
গল গালাগালি— যা আমরা অনুবাদ করতে অস্বীকার করছি।
এ তো বিদেশি পণ্য।
একজন পুরোহিতকে ধরে আনার সরকারি দায়িত্ব পেয়েছিলাম। আমাদের যেতে দাও...
না ! না ! বড়কর্তার সঙ্গে দেখা করো !
গথিক গালাগালি। অনুবাদ দেওয়া হল...
সে-সময়, সীমানার অন্য পারে...
তারপর ? কাজের সময় ঘুম ?
জার্মানি !
আমাকে একদল গথ পেছন থেকে আক্রমণ করেছে... তারা গথ দেশ জয় করতে যাচ্ছিল।
বাজে গপ্পো ! গথেরা গল দখল করতে পারে... গলেরা জার্মানি দখল করতে পারে...
গথেরা গথদের দেশ জার্মানি দখল করছে !! যত্তসব !!
কিন্তু...
পরে...
থামলে চলবে না। সীমানা পেরিয়ে জার্মানিতে ঢুকতে হবে।
আশা করি ওখানে বুনো শূকর আছে !
হুজুর কিছুতেই বুঝতে চান না !
গল সাম্রাজ্য রোমান
জা

হেপ !
গল
রোমান
সাম্রাজ্য
হুমম ?
ঢিসুম !
সীমানা পেরনো সত্যিই ঝামেলা !
রোমান সাম্রাজ্য
কর্তা ! কর্তা ! এবার সত্যি আক্রমণ !
?!
আক্রমণ ! কোথায় ?
দু'জন গল জার্মানিতে ঢুকেছে !
কিন্তু আক্রমণ তখনই হয়, যখন কেউ আমাদের দেশে ঢোকে !
আপনি বলেছিলেন...
চারদিনের শাস্তি। মজা করা টের পাবে !
এ তো মহাযন্ত্রণা !
সে-সময় গথরা তাদের নিজস্ব সরকারি নিয়মকানুন থেকে রেহাই পেয়েছে...
চাবুক
হে দলপতি মহাসাঙ্ঘাতিক ! আমরা সেরা পুরোহিতকে ধরে এনেছি। তার জাদু দিয়ে আমরা রোমান সাম্রাজ্য জয় করতে পারব।
শাবাশ ! ওকে খাঁচায় রাখা হোক ! পরে কথাবার্তা হবে !

সাবধান ! কেউ আসছে।
তোমরা কে ?
আমি গথিক ভাষা জানি না। তবে মনে হয় ও জানতে চায় আমরা কে।
সেলাম ! জুপিটারের নামে ! আমরা রোমান সৈন্য অ্যাসটেরাস ও ওবেলাস!
শ শ শ !
তাই তো ! মনে হচ্ছে এরা রোমান সৈন্য। আমাদের আক্রমণ করছে। হামলা করো।
ঢাঁই !
দুম !
ঢকাস !
চলো, ওই ঝোপে লুকোই। তোমাকে একটু বোঝাতে হবে।
রোমান ছদ্মবেশ নেওয়া আর বুদ্ধিমানের কাজ হবে না। বরং গথ সাজলে...
কেন ?
ওবেলিক্স ! এই হল সময় !
অ্যাই !
এক ঘণ্টা পর...
এতক্ষণে ! ভাবছিলাম আর কেউ আসবে না।

উফ
বুম !
গদাম !
আমাদের টুপির ওপর গথ হেলমেট পরে নাও !
বেশ !
মনে রেখো, আমরা ওদের ভাষা জানি না। সুতরাং ওদের সঙ্গে কিছুতেই কথা নয় !
কিন্তু মারা চলবে তো ?
তখন...
হে মহাসাঙ্ঘাতিক ! দোভাষী বহুভাষিক এসেছে।
নিয়ে এসো !
পুরোহিত আমার কথা না শুনলে আমি রেগে যাব। ওকে তো মেরে ফেলবই, বহুভাষিক, তোকেও ছাড়ব না।
অ্যাঁ ?...হ্যাঁ।
জিজ্ঞেস করো, ও আমাদের হয়ে কাজ করবে কি না।
আমাদের হয়ে কাজ করবে ?
না !
হতেও পারে !
'হ্যাঁ' বা 'না' বলুক।
হ্যাঁ ? না ?
না !
হ্যাঁ !
বাঃ ! কখন ও জাদু দেখাবে ?
এক সপ্তাহ পর। পূর্ণিমার দিন।
উফ ! একটু সময় পেলাম।

(শেষাংশ আগামী সংখ্যায়)

(৩০ পাতার পর)

অরণ্যদেব লি ফক

গল্প

রাজা

পুলককুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

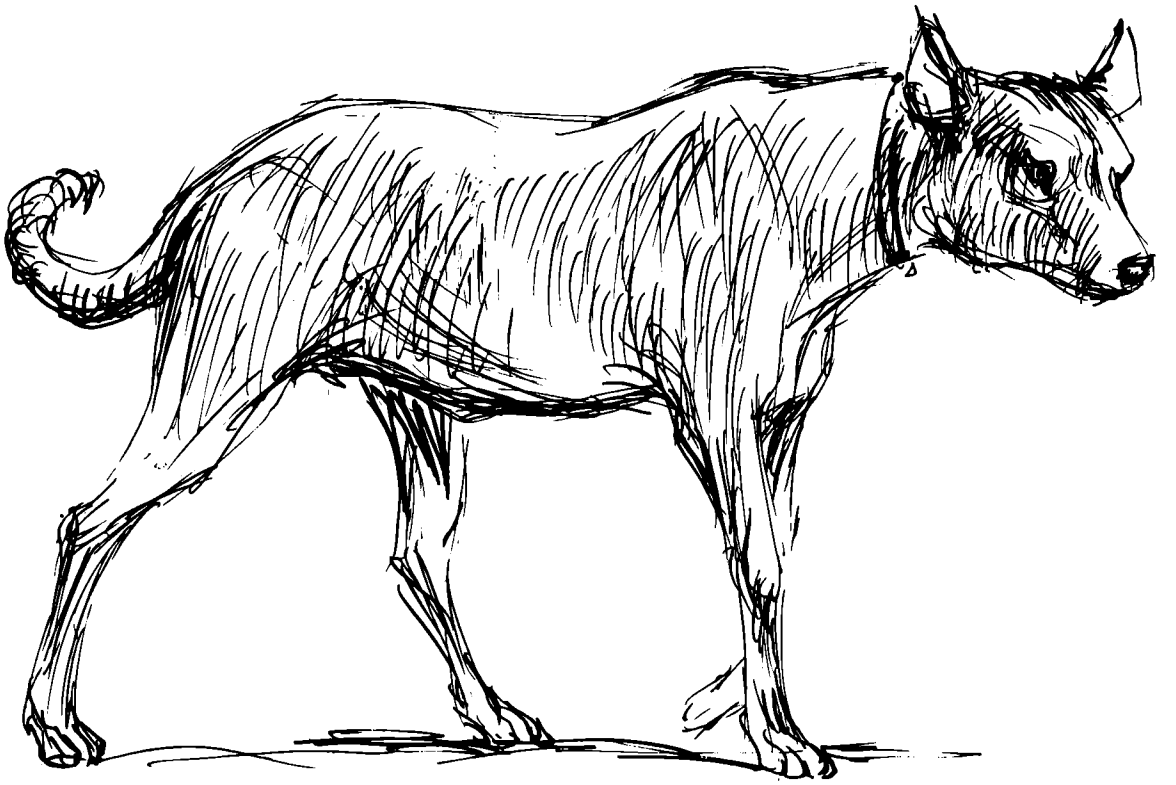

কয়েকদিন হল রাজার দাপট যেন হঠাৎ বেশ কমে গেছে। ব্যাপারটা নজরে পড়েছে এ-বাড়ির সকলেরই। সেই মেজাজও নেই, পাড়া মাতিয়ে রাখা সেই ডাকও প্রায় বন্ধ।

দেখেশুনে পরাশরবাবু মুষড়ে পড়েছেন। বারবার কারণ খুঁজছেন, কী হতে পারে! কেন রাজা এরকম ঝিমিয়ে পড়ল! আর, তিনি ছাড়া কে আছে এ-বাড়িতে যে, রাজার জন্য এমন চিন্তা ভাবনা করবে?

সত্যি-সত্যিই বোধ হয় কেউ ভাবে না। নইলে, প্রথম যেদিন তাকে এ-বাড়িতে আনা হল সেদিন পরাশরবাবুকে হাজারটা কথা শুনতে হয়! রসালো মন্তব্য আর টিপ্পনির শেষ নেই। এ-তল্লাটের পয়সাওলা একজন মানুষ তো ইচ্ছে করলেই হাজার-দু' হাজার খরচ করতে পারেন। শখ মেটানোর জন্য অ্যালসেশিয়ান, ডোবারম্যান, স্পিতজ, লাসা, বুলডগ—কত কী আছে! কিংবা, পয়েন্টার বা গ্রে-হাউন্ড নিয়ে আসাও কঠিন কিছু নয়। সেসব বাদ দিয়ে কিনা একটা নেড়িকুকুর! রাস্তা থেকে তুলে আনা! তাও গায়ের রং কিংবা চেহারাটা যদি নজরকাড়া কিছু হত! পরাশরের বন্ধু রামলোচন বলেছিলেন, "ওটা নির্ভেজাল খেঁকি। যতই পোষ মানাও, সুযোগ পেলেই বনবাদাড়ের দিকে ছুটবে। কথাটা মিলিয়ে নিয়ো।"

সে-সব কথা কানে তোলেননি পরাশরবাবু। যে যা বলছে বলুকগে। তিনি তখন নামের জন্য ব্যস্ত। একটা জুতসই নাম দিতে হবে ওর।

শেষমেশ নাম মিলল। নিজেই ঠিক করলেন। 'রাজা'।

সেদিনের সেই ফুটফুটে রাজা কী তাড়াতাড়িই না বড় হয়ে গেল! যেমন দাপট, তেমনই গলার আওয়াজ। পাড়ার লোকজন জানতে পারে রাজা ডাকছে। পরাশরবাবু মনে-মনে গর্ব বোধ করেন। যারা একদিন খেঁকি বলে উপহাস করেছিল, এখন তারা হঠাৎ বাড়িতে ঢুকতে পর্যন্ত ভয় পায়। অথচ আশ্চর্য, কারও শরীরে দাঁতের দাগ বসায়নি রাজা। খাওয়াদাওয়ার ব্যাপারেও যথেষ্ট বাছবিচার। দেখলেই বোঝা যায় ঠাটবাট, স্বভাবেও যাকে বলে পুরোদস্তুর অহঙ্কারী।

এহেন তেজালো রাজা হঠাৎই ঝিমিয়ে পড়ল কেন? পরাশরবাবুর মনখারাপ। নিজের কোনও সন্তান নেই, হয়তো তাঁর সব স্নেহ-ভালবাসাটুকু উজাড় করে ঢেলে দিয়েছেন রাজার ওপরেই। তাই রাজার কিছু হলে তিনি কষ্ট পান। এই ক'দিন আগেও যে এমন দাপিয়ে বেড়াত, সে হঠাৎ খাওয়াদাওয়া বন্ধ করল কেন? মাঝে

বার-কয়েক বমিও হয়েছে। পরাশরবাবু লক্ষ রাখছেন পরিস্থিতি। একসময় তিনি বেশ ঘাবড়েও গেলেন। বমির সঙ্গে রক্ত বের হচ্ছে।

পরাশরবাবু আর অপেক্ষা করলেন না। পশুর ডাক্তারকে পাওয়া যায় জেলা শহরে। অগত্যা তাঁকেই হাজির করলেন বাড়িতে।

ডাক্তারবাবু যেন খুব একটা গুরুত্ব দিলেন না, সামান্য জ্বর হয়েছে। তেমন কিছু নয়।

পরাশরবাবু ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে একটা প্রশ্নই তোলেন, "কিন্তু রক্ত!" ডাক্তার এড়িয়ে গেলেন, "বলছি তো, ভয়ের কিছু নেই। ভাল হয়ে যাবে।"

কিন্তু অশান্তি শুরু হয়ে গেছে পরাশরবাবুর সংসারে। পাড়াপ্রতিবেশী, বন্ধুবান্ধব সকলেরই একটা মৃদু অভিযোগ জমা হচ্ছে আস্তে-আস্তে। কারণ কী, না একটা রোগগ্রস্ত কুকুরকে তিনি এখনও বাড়িতে রেখেছেন। না-হয় ডাক্তার দেখানো হয়েছে, কিন্তু খারাপ অসুখও তো হতে পারে। কী থেকে কী হয়! রোগ-মহামারী এভাবেই তো ছড়িয়ে পড়ে। তখন সামলাবে কে!

রামলোচন চাটুজ্যে তো বলেই বসলেন, "এখনও সময় আছে। ওটাকে বিদেয় করো হে! দেখছ না, তোমার ওই পশুর ডাক্তার আসলে রোগটাই ধরতে পারেননি। মারাত্মক কিছু একটা অসুখ হয়েছে ওর। বাড়িতে পাঁচটা লোক আছে, কেন অহেতুক রোগ ছড়াবার সুযোগ দিচ্ছ?"

অবশ্য, রামলোচনের ক্ষোভ আছে অন্য কারণে। আর কাউকে না হোক, রামলোচনকে দেখলে রাজা মুখ দিয়ে কেমন যেন একটা গরর, গরর আওয়াজ করে, সুযোগ পেলেই বুঝি কামড়াবে এমনই ভাবখানা। রামলোচন ভয় পান। এ-বাড়িতে আসা-যাওয়াও ইদানীং অনেক কমিয়ে দিয়েছেন। বলা যায় না, একটু আঁচড় কি দাঁত বসিয়ে দেওয়া মানেই জলাতঙ্কের ভয়। হাইড্রো-ফোবিয়া! ছাতার শিকের মতো ইনজেক্শনের সুচ। উঃ, ভাবতেই গা শিউরে ওঠে!

কিন্তু রামলোচনের কথাবার্তাকে তেমন গুরুত্ব না দিলেও, পরাশরবাবু তাঁর পাড়ার লোকজনের উপদেশ, বাড়ির লোকের গঞ্জনা—এসব ঠেলবেন কী করে! স্ত্রী তো কথায়-কথায় শুনিয়ে দিচ্ছেন, "আদিখ্যেতা দেখে বাঁচি না। কাঁড়ি-কাঁড়ি পয়সা ঢেলে ওষুধ খাওয়ানো হচ্ছে, উন্নতির নামগন্ধ তো এতটুকু নেই।"

পরাশরবাবু ভেবেচিন্তে কূলকিনারা খুঁজে পান না। কী করবেন এখন রাজাকে নিয়ে? সকলেই

চাইছে তাকে বরং অন্য কোথাও ছেড়ে দিয়ে আসা হোক। এইরকম রোগগ্রস্ত কুকুর আবার যদি হঠাৎ পাগল হয়ে যায়! যদি কামড়াকামড়ি শুরু করে! সেই ভয়টা এখন পরাশরবাবুকেও পেয়ে বসেছে।

শেষমেশ সিদ্ধান্তটা পাকা করেই ফেললেন। তাঁকে কঠিন হতেই হবে। নিজের মনটাকে শক্ত করতে হবে যা হোক করে।

চেন দিয়ে রাজাকে বেঁধে ঘর থেকে বের হলেন পরের দিন। স্টেশন পর্যন্ত রাস্তাটুকু তিনি হেঁটেই যান। দুর্গাপুরে চাকরি করেন পরাশরবাবু। ডেলি-প্যাসেঞ্জার। সকালে বেরিয়ে সন্ধের মধ্যে ফিরে আসেন। আজ হাতে একটু সময় নিয়েই বেরিয়েছেন। স্টেশনের কাছাকাছি একটা 'সিনেমা হল'। অনেকদিন ধরে তালাবন্ধ। তার পেছনে খানিকটা ফাঁকা জায়গা। পাশেই পোড়ো জমিতে গুটিকয়েক ঘর নিয়ে অভাবী মানুষের বসতি। পরাশরবাবু সিনেমা হলের পেছনে গিয়ে রাজার গলার চেনটা আস্তে-আস্তে খুললেন। অনেকখানি পথ হাঁটায় সে বেশ ক্লান্ত। শরীর এলিয়ে শুয়ে পড়েছে। পরাশরবাবু ব্যাগ থেকে দু'টুকরো পাউরুটি বের করে মুখের সামনে এগিয়ে দিলেন। চোখ বুজে পাউরুটি চিবোচ্ছে রাজা, পরাশরবাবু আস্তে-আস্তে সরে গেলেন সেখান থেকে। কোনওদিকে না তাকিয়ে তাড়াতাড়ি প্ল্যাটফর্মে গিয়ে উঠলেন।

ট্রেনটাও প্রায় সঙ্গে-সঙ্গেই এসে পড়েছে। ভিড়ভর্তি কামরা। কোনওরকমে দাঁড়াবার মতো জায়গাটুকু পেয়েছেন। ট্রেন চলছে। জানলা দিয়ে একবার বাইরের দিকে তাকাবার চেষ্টাও করলেন। মনটা মাঝে-মাঝে ছটফট করছে। কিন্তু যা দেখতে চাইছেন তা দেখতে পেলেন না।

অফিসের চেয়ারে বসেও সুস্থির হতে পারছেন না পরাশরবাবু।

কেবলই মনে হচ্ছে, তিনি কি ঠিক করলেন? যা হওয়ার হত, বরং রাজাকে ঘরে রাখলেই পারতেন! এটা বড় স্বার্থপরতার কাজ হয়ে গেছে। রাজা আর বেশিদিন বাঁচবে না, তাঁর স্থির বিশ্বাস। কথাটা ভাবতে-ভাবতেই দুঃখে মন ভরে উঠল।

"সার, আজ কি কিছু খাবেন না?"

ঘড়ির দিকে তাকিয়ে দেখলেন, প্রায় তিনটে বাজতে চলেছে। উঠে পড়লেন চেয়ার ছেড়ে।

শরীরটা কেমন ঝিমঝিম করছে। তাড়াতাড়ি অফিস থেকে বেরিয়ে পড়লেন। আগের ট্রেন ধরে স্টেশনে নামলেন। হন্তদন্ত পায়ে এগিয়ে গেলেন সিনেমাহলের পেছন দিকে। ভাবতে ভাবতে আসছিলেন, হয়তো রাজা সারাদিন সেখানেই পড়ে থাকবে। তাই বাড়িতে ফিরিয়ে নিয়ে যাবেন তাকে।

কোথায় কী! সব ফাঁকা, সুনসান। কী মনে করে, পরাশরবাবু পায়ে-পায়ে গিয়ে হাজির হলেন আদিবাসীদের পাড়ায়। একজনকে দেখতে পেয়ে জিজ্ঞেস করলেন, "সকালে এখানে একটা কুকুরকে দেখেছ?"

লোকটা ভাল করে বুঝতেও পারল না, শুধু লম্বা করে মাথা নাড়ল।

আর-একজনকে জিজ্ঞেস করলেন রাজার কিছুটা বর্ণনা দিয়ে। তারও একই উত্তর, "না বাবু, সেরকম তো কিছু নজরে পড়েনি। তবে, কে অত খেয়ালই বা রাখে!"

কথাটা ঠিক। পরাশরবাবুর কুকুরের জন্য কার আর মাথাব্যথা! খেয়ালই বা রাখছে কে!

প্রায় নিরাশ হয়ে ফিরছিলেন পরাশরবাবু। একটা অল্পবয়সী ছেলে খানিকটা যেন আশার কথা শোনাল, "একটা উটকো কুকুর ঘুরছিল বটে। ওই হোথায়।"

আঙুল তুলে দূরের দিকে দেখাতেই পরাশরবাবু হঠাৎ উদ্‌গ্রীব হয়ে উঠলেন, "ঠিক দেখেছ? খয়েরি রং, দু' কানের পাশে সাদা দাগ।"

"অত মনে নেই।" ছেলেটা নিরুৎসাহিত গলায় বলল, "আমাদের পাড়ার কুকুরগুলোর সঙ্গে খুব মারামারি হচ্ছিল।"

"তারপর?"

"আর দেখিনি। কোথায় গেল কে জানে!"

যেন দপ করে একটা বেলুন চুপসে গেল পরাশরবাবুর বুকের খাঁচায়। আর কিছু ভাবতে পারছেন না তিনি। আস্তে-আস্তে বাড়িমুখো রাস্তা ধরলেন।

সদর দরজা পেরিয়ে সবেমাত্র উঠোনে পা দিয়েছেন, স্ত্রী জিজ্ঞেস করলেন, "রাজাকে তা হলে বিদেয় করে এসেছ?"

কথাটার মধ্যে হয়তো বিদ্রূপের খোঁচা আছে। পরাশরবাবু তা সত্ত্বেও ঠান্ডা মাথায় জবাব দিলেন, "হ্যাঁ।"

"কোথায় ছাড়লে তাকে?"

"স্টেশনের ধারে। ইস, রাজা বোধ হয় এখন আর বেঁচে নেই!"

স্ত্রী এবার প্রচ্ছন্ন রসিকতার সুরে বললেন, "আহা! তা কী করে হয়! তুমি ওকে নিয়ে বেরিয়ে গেলে, ঘণ্টাখানেক কি ঘণ্টাদেড়েক পর, তখন বোধ হয় তুমি অফিসেও পৌঁছওনি, ঘরের রাজা গুটিগুটি করে ফিরে এল।"

"অ্যাঁ!" পরাশরবাবু যেন বিস্ময়ে লাফিয়ে উঠলেন, "তাই নাকি? কোথায় রাজা?"

"ওপরের বারান্দায় শুয়ে আছে তোমার গুণধর। গিয়ে একবার চেহারাটা দেখে এসো। মড়ার ওপরে খাঁড়ার ঘা। অন্য কুকুরের সঙ্গে মারামারি করে কী হাল হয়েছে ওর।"

পরাশরবাবু আর না দাঁড়িয়ে সোজা ওপরে উঠলেন। রাজা কুণ্ডলী পাকিয়ে শুয়ে আছে। সারা শরীরে খাবলা-খাবলা মাংস ওঠা। বোঝা যায়, বেশ যন্ত্রণা হচ্ছে। তবু এই পরিচিত পরিবেশে মানুষটিকে দেখে অস্পষ্ট কুঁই-কুঁই আওয়াজ বের করার চেষ্টা করল গলা দিয়ে।

পরাশরবাবুর মনে আবার অন্য ভাবনাচিন্তা। যে ভয়ের জন্য সকালে ওকে নিয়ে বেরিয়েছিলেন, এখন সে অন্য কুকুরের বিষ শরীরে ঢুকিয়ে বাড়ি ফিরেছে। হয়তো এই ঘটনাটা আরও বেশি মারাত্মক।

তার চেয়ে ওর মরে যাওয়াটাই বরং ভাল।

মনে মনে বলেন, "ঈশ্বর, রাজাকে এবার মুক্তি দাও!"

রাত্রে খেতে দিলেন পরাশরবাবু। গরম দুধের বাটি নিজের হাতে এগিয়ে দিলেন মুখের সামনে। রাজা খেল না। নিস্তেজ হয়ে পড়ে রইল একপাশে।

পরের দিন ভোরবেলায় এক তাজ্জব ব্যাপার।

গোটা বাড়িতে কোথাও রাজা নেই। বারান্দা ফাঁকা, দোতলার ছাদ ফাঁকা, চোরকুঠুরি, মরাইয়ের তলা, সিঁড়ির ঘর—সর্বত্র খোঁজাখুঁজি করেও তাকে পাওয়া যাচ্ছে না। শুধু পড়ে আছে দুধভর্তি বাটি। মেঝের ওপরে রক্তের দাগ, ক্ষতস্থান থেকে বেরিয়েছে।

কোথায় গেল রাজা? কীভাবেই-বা বের হবে বাড়ি থেকে?

তন্নতন্ন করে খুঁজে পরাশরবাবু ছাদ থেকে উঁকি দিলেন রাস্তার দিকে। আর তারপরেই চমকে উঠলেন দৃশ্যটা দেখে। ভয়ঙ্কর সেই দৃশ্য!

রাস্তার ওপরে রাজা মুখ গুঁজে পড়ে আছে।

তা হলে কি রাজা মানুষের ভাষা বুঝতে পারত? তার প্রতি অবহেলা আর অবজ্ঞার ভাষা! হয়তো নিজের আশ্রয়ে ফিরে এসে বেঁচে থাকতেই চেয়েছিল। হয়তো বুঝেছিল এখানে ভালবাসা নেই, তাই ফের ছাদ টপকে নিঃশব্দে পালিয়ে যাচ্ছিল। চেষ্টা করেছিল, পারেনি। মুখ দিয়ে শেষবারের মতো দমকে-দমকে রক্ত তুলে তার শরীরটা এখন শক্ত, কঠিন।

পরাশরবাবু ঝুঁকে পড়ে রাজাকে দেখছেন আর হাজার কথা ভাবছেন। তাঁর চোখের কোণে জল।

ছবি : সুব্রত গঙ্গোপাধ্যায়

সাড়া জাগিয়েও হারিয়ে যাচ্ছেন বহু নতুন সাঁতারু

সম্প্রতি কলকাতায় বসেছিল সুবর্ণজয়ন্তী জাতীয় সাঁতারের আসর। রীতিমত কৃতিত্ব দেখিয়েছেন বেশ কয়েকজন তরুণ সাঁতারু। আলোচনা করেছেন **চন্দন রুদ্র**

জয়তীর্থ অভিজিৎ ও সঙ্গীতারানি পুরি
ফোটো : অশোক চক্রবর্তী

জাতীয় সাঁতারের ৫০ বছর হয়ে গেল। স্বাধীনতার আগে, ১৯৪৪ সালে বোম্বাই শহরে বসেছিল প্রথম জাতীয় সাঁতারের আসর। এই ধরনের প্রতিটি আসরেই অনেক রেকর্ড ভাঙে-গড়ে। উঠে আসেন অনেক প্রতিশ্রুতিমান সাঁতারু। কলকাতায় এবারের সুবর্ণজয়ন্তী জাতীয় সাঁতারেও বহু রেকর্ড ভেঙে গেল। বেশ কয়েকজন তরুণ সাঁতারু রীতিমত চমকে দিলেন আমাদের। প্রথমবার সিনিয়ার জাতীয় সাঁতারে নেমেই একের পর এক সোনা জয় করে সাড়া জাগালেন দিল্লির কিশোরী সঙ্গীতারানি পুরি। সাতটি সোনা জয় করে মহিলা বিভাগের সেরা সাঁতারু হন তিনি। ব্যক্তিগত পাঁচটি সোনাতেই গড়েছেন নতুন জাতীয় রেকর্ড। দিল্লির বাসিন্দা সঙ্গীতার জন্ম ত্রিনিদাদে। বাবা রাজ পুরি ভারতীয় হলেও মা মইন দেবী ত্রিনিদাদের মেয়ে। আমেরিকার লস অ্যাঞ্জেলিস থেকে সাঁতারে প্রশিক্ষণ নিয়ে আসা এই সম্ভাবনাময় সাঁতারুটির সঙ্গে লড়াইয়ে নেমে কর্নাটকের মেঘনা নারায়ণ এবার তুলে নিয়েছেন পাঁচটি সোনা। ৪০০ মিটার ফ্রিস্টাইলে সঙ্গীতাকে পেছনে ফেলে এগিয়ে গিয়েছেন মেঘনা। অনিতা সুদের রেকর্ড ভেঙে দিয়েছেন তিনি। কলকাতার মেয়ে ঈশানী ঘোষ ১৯৯৪ সালের জাতীয় সাঁতারে হাই বোর্ড ডাইভিং-এ সেরা হয়ে সোনা পেয়েছিলেন। কলম্বোয় 'এশীয়

প্যাসিফিক' সাঁতারে সোনা জয়ী স্কুলের ছাত্রী ঈশানী এবারও জাতীয় সাঁতারে বাংলার একমাত্র সাফল্যটি ধরে রেখেছেন। পুরুষ বিভাগে গত বছরের মতো এবারও সেরা ছিলেন ১৬ বছরের তরুণ পুলিশের জয়তীর্থ অভিজিৎ। ছ'টি সোনার মধ্যে চারটিতেই অভিজিতের নতুন জাতীয় রেকর্ড। কলকাতার সুভাষ সরোবরে এবারের সুবর্ণজয়ন্তী জাতীয় সাঁতারের ছবি যখন এইরকম, তখন প্রশ্ন উঠতে পারে, ভারতে সাঁতার চর্চা আজ ঠিক কোন পর্যায়ে ?

সত্যি কথা বলতে কী, এই ৫০ বছরে ভারতে প্রতিযোগিতামূলক সাঁতার জনপ্রিয় হলেও আন্তর্জাতিক স্তরে ভারতের সাঁতার আজও কিন্তু সেই পেছনের সারিতেই রয়ে গেছে। জাতীয় স্তরে আমাদের দেশের সাঁতারুদের সাফল্যের খতিয়ান যতটা উজ্জ্বল, আন্তর্জাতিক স্তরে ঠিক ততটাই নিষ্প্রভ। ওলিম্পিক অনেক দূরের কথা, এশিয়ান গেম্‌স থেকেও আজ ভারতীয় সাঁতারুরা একেবারে শূন্য হাতে ফিরে আসছেন। ১৯৫১ সালে দিল্লির প্রথম এশিয়াডে ভারতীয় সাঁতারুরা বেশ কয়েকটি পদক পেয়ে চমকে দিয়েছিলেন বটে, পরবর্তী আসরগুলিতে সে সাফল্য এ-দেশের সাঁতারুরা আর ধরে রাখতে পারেননি। এশিয়াড সাঁতার থেকে এ-পর্যন্ত ভারত যে চারটি সোনা, চারটি রুপো এবং সাতটি ব্রোঞ্জ পদক পেয়েছে তার দুটি রুপো এবং দুটি ব্রোঞ্জ ছাড়া সবক'টি পদকই এসেছে ওই প্রথম এশিয়াড থেকে। ১৯৮৬ সালে সোল এশিয়াডে ২০০ মিটার 'বাটার ফ্লাই'-এ সাঁতারু খাজান সিং-এর রুপো জয় এশিয়াড সাঁতারে ভারতের শেষ পদক পাওয়া। হাল আমলে আন্তর্জাতিক স্তরে ভারতীয় সাঁতারুদের সাফল্য কেবল সাফ গেম্‌সের মধ্যেই সীমায়িত। অন্যদিকে চিন, জাপান, কোরিয়ার মতো এশীয় দেশগুলি সাঁতারে ক্রমশ উন্নতি করছে। শুধু এশিয়ান গেম্‌সেই নয়, ওলিম্পিকের আসরেও তারা সফল হচ্ছে দারুণভাবে, গড়ে তুলছে নতুন রেকর্ড।

বিদেশের ১৩-১৪ বছরের ছেলেমেয়েরা যখন আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতা থেকে সোনার পদক নিয়ে যান, তখন এ-দেশের সাঁতারুরা ফিরে আসেন শূন্য হাতে। ভারতীয় সাঁতারের এই বেহাল অবস্থাটা কিন্তু একদিনেই তৈরি হয়নি। উপযুক্ত প্রশিক্ষণের অভাব, পরিকাঠামোর গলদ এবং আরও নানা প্রতিবন্ধকতার দরুন বহু খেলাধুলোর মতোই ভারতের সাঁতারও বিশেষ এগোতে পারেনি। বহু রাজ্যে আজও সেভাবে সুইমিং পুলের ব্যবস্থা নেই। পুকুর, ডোবায় সাঁতার কেটে এসে সাঁতারুরা জাতীয় প্রতিযোগিতায় নামছেন। এবার কলকাতায়

ঈশানী ঘোষ

জাতীয় সাঁতার হল 'টাচ প্যাড' ছাড়াই। অথচ আন্তর্জাতিক মানের যে-কোনও প্রতিযোগিতায় 'টাচ প্যাড' জরুরি। আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতায় ব্যর্থ হয়ে ফিরে আসবার পরই শুরু হয় অভিযোগ, অনুযোগ, উতোর-চাপান। ব্যর্থতার প্রকৃত কারণ খোঁজা হয় না। ফলে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে ভারতের স্থান নামতে-নামতে প্রায় শূন্যের ঘরে ঠেকেছে। কাঙ্ক্ষিত সাফল্য আসছে না। সাড়া জাগিয়েও হারিয়ে যাচ্ছেন বহু নতুন প্রতিভা।

কলকাতায় সুবর্ণজয়ন্তী জাতীয় সাঁতারের শেষে দেশের বেশ কয়েকজন প্রাক্তন জাতীয় সাঁতারুর সঙ্গে কথা বলেছিলাম। বেশিরভাগ সাঁতারুই

ভানু সচদেব ফোটো : রাজীব দে

মনে করেন, ত্রুটিপূর্ণ পরিকাঠামো এবং কর্মকর্তাদের স্বেচ্ছাচার সাঁতারের এই অবস্থার জন্য দায়ী। খাজান সিং-এর মতে, দেশের সাঁতার ফেডারেশনের উচিত দীর্ঘমেয়াদী প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা। এবারের জাতীয় প্রতিযোগিতার দুই সেরা সাঁতারু সঙ্গীতা এবং অভিজিতের ভূয়সী প্রশংসা করে খাজান বলেন, "পারফরম্যান্স ধরে রাখতে পারলে এঁরা দু'জন ভবিষ্যতে আন্তর্জাতিক স্তরে সাফল্য পেতে পারেন।" আর-এক প্রাক্তন জাতীয় সাঁতারু বাংলার সঞ্জীব চক্রবর্তী মনে করেন, "দেশে সাঁতারুর অভাব নেই। অভাব উপযুক্ত পরিকাঠামোর।" গ্রাম-গঞ্জ থেকে বহু নতুন সাঁতারু উঠেও হারিয়ে যাচ্ছেন। কেন হারিয়ে যাচ্ছেন তার কারণ ফেডারেশনকে খুঁজে দেখতে হবে। বহু আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতায় দেশের হয়ে অংশ নেওয়া সাঁতারু সঞ্জীবের অভিমত, "খেলাধুলোয় এগিয়ে যাওয়া দেশগুলির মতো গোড়া থেকেই সাঁতারুদের প্রকৃত অনুশীলনের ব্যবস্থা করতে হবে। সেইসঙ্গে আরও বেশি প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা করাও জরুরি।"

১৮ থেকে ২৭ ডিসেম্বর ভারতের মাদ্রাজ শহরে বসছে সপ্তম সাফ গেম্‌সের আসর। গত আসরে দুর্বল প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে জলে নেমে ভারতীয় সাঁতারুরা সাঁতারের ১৬টি ইভেন্টের মধ্যে দুটি রেকর্ড সহ ১১টিতেই নিয়ে এসেছিলেন সোনা। পাঁচটি রুপো এবং দুটি ব্রোঞ্জ সহ ১৮টি পদক পেয়েছিল ভারত। গতবারের মতো এবারও হয়তো সেবাস্তিয়ান জেভিয়ার, জয়তীর্থ অভিজিৎ, ভানু সচদেবরা জলে নেমে তুলে আনবেন ভূরি-ভূরি সোনা। কিন্তু সাফ গেম্‌সের সাফল্যই কি ভারতীয় সাঁতারের শেষ কথা ?—এ-বিষয়ে সকলকে ভাবতে হবে।

খেলার খবর

ভারতীয় ক্রিকেট দলের অধিনায়ক মহম্মদ আজহারউদ্দিনের কাছে এমন একটি জিনিস আছে, যা এ-দেশে আর কারও কাছে নেই। সেটি হল, একটি মার্সিডিজ ৩২০ মডেলের গাড়ি। জার্মানি থেকে এই গাড়িটি আনিয়েছেন আজহার। দাম পড়েছে ৮০ লক্ষ টাকা। শীতাতপনিয়ন্ত্রিত অত্যাধুনিক এই গাড়িটির বৈশিষ্ট্য, এতে শুধু বসাই যায় না, ইচ্ছে করলেই দিব্যি আরামে শুয়ে বেড়ানোও যায়। আজহারের এটি দ্বিতীয় মার্সিডিজ গাড়ি। গাড়ি এবং ঘড়ি আজহারের খুব প্রিয়। নানা ধরনের ঘড়ি তাঁর সংগ্রহে আছে। এই মার্সিডিজ গাড়িটি কিনে আজহার বিশ্বের সবচেয়ে ধনী ক্রিকেটার শচীন তেণ্ডুলকরের থেকে অন্তত দামি গাড়ি সংগ্রহের ব্যাপারে এগিয়ে রইলেন। এবার শচীন কী সংগ্রহ করে আমাদের চমকে দেন সেটাই দেখার।

❑

চিরাচরিত পতাকা এবং বাঁশিই শুধু নয়, আগামী ওলিম্পিকে ফুটবল মাঠে রেফারি এবং লাইন্সম্যানদের হাতে আরও কিছু অতিরিক্ত জিনিস দেখা যাবে। লাইন্সম্যানদের হাতে থাকবে 'ইলেকট্রনিক ট্রান্সমিটার' এবং রেফারির কাছে থাকবে 'রিসিভার'। ফুটবলারদের অনেক চোরাগোপ্তা ফাউল অনেক সময় রেফারির নজর এড়িয়ে যায়। সেগুলির প্রতি এখন নজর রাখবেন লাইন্সম্যানরা। এবং সঙ্গে-সঙ্গে ট্রান্সমিটারের সাহায্যে সে-খবর জানাবেন রেফারিকে। অর্থাৎ এখন থেকে ফাউল করে আর রেহাই পাওয়ার উপায় রইল না। ফিফা অবশ্য পরীক্ষামূলকভাবে এই ব্যবস্থা আপাতত চালু করছে। সাফল্য পেলে আগামী দিনে এই ব্যবস্থা স্থায়ী হবে।

❑

আটলান্টা ওলিম্পিক কর্তৃপক্ষ এখন খুব বিপদে পড়েছেন। ওলিম্পিকের সময় প্রতিযোগী এবং কর্মকর্তাদের থাকার জন্য প্রচুর ঘরের দরকার। আটলান্টার বেশিরভাগ হোটেলই এখন থেকে 'বুক' করে রেখেছেন কর্তৃপক্ষ। কিন্তু শুধু হোটেলের ঘর দিয়েই তো কাজ চলবে না। দরকার আরও ঘর। স্থানীয় বাসিন্দারা পরিষ্কার জানিয়ে দিয়েছেন, তাঁরা ওলিম্পিক কর্তৃপক্ষকে বাড়ি দেবেন না। বরং ওলিম্পিক চলার সময় অনেক টুরিস্ট আসবেন, তাঁদের ভাড়া দেবেন। তাঁরা লাভও করবেন প্রচুর। কারণ এখন যে ঘরের ভাড়া মাত্র ৩০ ডলার, ওলিম্পিকের সময় তার ভাড়া হবে ১০০০ ডলার!

❑

বিশ্বকাপের আগেই শচীন তেণ্ডুলকরের একটি প্রামাণ্য জীবনী পেতে চলেছি আমরা। এই জীবনী শচীনের ছেলেবেলা এবং তাঁর বেড়ে ওঠার দিনগুলি নিয়ে। লিখছেন তাঁকে সবচেয়ে কাছ থেকে দেখেছেন যিনি, সেই অজিত তেণ্ডুলকর। অজিত শুধু শচীনের দাদা নন, একেবারে শুরু থেকেই তাঁর 'গাইড' এবং প্রধান পরামর্শদাতা। অজিতের হাত ধরেই শচীন বোম্বাইয়ে রমাকান্ত আচরেকরের শিবাজি পার্কের নেটে যান। অজিত শচীনকে পরিশ্রম করার ব্যাপারে উৎসাহ জোগান সবচেয়ে বেশি। তিনি শচীন সম্পর্কে নানা অজানা ও মজার গল্প লিখছেন এই বইয়ে। বইটি মরাঠি ভাষায় অনুবাদ করবেন শচীনের বাবা অধ্যাপক রমেশ তেণ্ডুলকর। বহু নামী-দামি প্রকাশক এই বই প্রকাশের ব্যাপারে আগ্রহ দেখিয়েছেন। বোঝাই যাচ্ছে, বইটি প্রকাশিত হওয়ার সঙ্গে-সঙ্গেই 'বেস্ট সেলার'-এর তালিকায় চলে যাবে।

❑

পাকিস্তানের জানশের খান একটি অসাধারণ রেকর্ড গড়লেন। তিনি 'ওয়ার্ল্ড ওপেন স্কোয়াশ' টাইটেল জিতলেন সাতবার। পাকিস্তানেরই আর এক প্রবাদতুল্য স্কোয়াশ খেলোয়াড় জাহাঙ্গির খানের দখলে আগে এই রেকর্ডটি ছিল। তিনি জেতেন ছ'বার। জানশের অবশ্য সাতবার জিতে মোটেই খুশি নন। তিনি বলেছেন, "আমি ১০ বার জিততে চাই। সেটা একটা অসাধারণ ব্যাপার হবে।" ২৬ বছরের জানশের আরও জানান, "আস্তে-আস্তে বয়স বাড়ছে। এখন একবার হারলেই আমার উৎসাহ অনেকটা কমে যাবে। সেজন্য আমি খুব সতর্কভাবেই খেলি, লক্ষ্যও রাখি অনেকটা উঁচুতে।" প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যেতে পারে, এবারের বিশ্ব স্কোয়াশ চ্যাম্পিয়ানশিপে জানশেরের প্রতিদ্বন্দ্বী ব্রিটেনের ডেল হ্যারিস খুব ভাল খেলেন। শেষপর্যন্ত অবশ্য জানশেরের দুর্দান্ত 'স্ট্রোক প্লে'-র কাছে তিনি ধরা দিতে বাধ্য হন।

দর্শক

ডাঃ রেক্স মর্গান

শুনুন, লাস ভেগাসের ফ্লাইটটা কি এসে গেছে ?
এসেছে মনে হয় ।
AIR
হ্যাঁ, ১৭নং গেটে ফ্লাইট ৪২৭-এর জিনিসপত্র নামানো হচ্ছে ।
রেক্স, আমি এখানে !
তোমার কথা খুব মনে পড়ছিল ।
আমিও শুধু তোমার কথাই ভাবছিলাম । শুধু তোমার কথা ।
আমার কথা ?
আমাদের সম্পর্কের কথাই ভাবছিলাম... বারবার শুধু মনে হচ্ছিল ..
কী মনে হচ্ছিল ? এখন কী ভাবছ, ডাক্তার ?
2-19

ডাঃ রেক্স মর্গান
কী হয়েছে ?
জানি না... ওরা আমাকে বলল, "এখন যাও, পরে এসো।"
দোহাই... ডাঃ মর্গানকে নাক গলাতে দেবেন না।
রেক্স, তুমি কী যেন বলছিলে আমাকে ? ওয়েটার এসে পড়ায় আর বলতে পারোনি !
হ্যাঁ... বলছিলাম যে... আমরা... ?
বলো... ?
আমাদের দু'জনের পরিচয় তো বহুদিনের। তা'ই না ?
হ্যাঁ, রেক্স... তা'ই তো !
কিন্তু, তুমি কি এই কথাটাই তখন বলছিলে ? তা তো নয় !
না... এই কথাটা নয়...
2-26
জুন, এই পৃথিবীতে তুমিই আমার একমাত্র আপন বলে মনে হয়।
ও রেক্স, কী বলব ! আমার চোখে জল আসছে !

প্রি-ওলিম্পিক হকিতে কি জিততে পারবে ভারত

আসন্ন প্রি-ওলিম্পিক হকি টুর্নামেন্টে ভারতীয় হকি-দল কেমন খেলবে ? পারবে কি তারা সফল হতে ? আলোচনা করেছেন প্রতাপ জানা

এখন অদ্ভুত সন্ধিক্ষণের মুখে ভারতীয় হকি। একটির পর একটি টুর্নামেন্টে ব্যর্থ হওয়ার পর আজলান শাহ ট্রোফি জিতে এবার ভারত ট্রোফি জয়ের খরা কাটিয়েছে। এর আগে ভারত আন্তর্জাতিক হকিতে শেষবার ট্রোফি জিতেছিল ১৯৯৩ সালে আক্সস কাপ। তারপর ভারতের এই সাফল্য। ভারত ঘুরে দাঁড়িয়েছে। আজলান শাহ ট্রোফি জয়ের সুবাদে ভারতীয় হকি নিয়ে এই মুহূর্তে বেশ আশার কথাও শোনা যাচ্ছে। সত্যিই কি এখন ভারতীয় হকি-দলের ওপর আস্থা রাখা যায় ? ভারতীয় হকি-দলের প্রধান কোচ বাসুদেবন ভাস্করন নিজেই বলেছেন, "আরও উন্নতির দরকার। বিশেষ করে পেনাল্টি কর্নার ও গোলের সহজ সুযোগ কাজে লাগানোর ক্ষেত্রে।" সাফল্য সবসময়ই দলের আত্মবিশ্বাস ও মনোবল বাড়িয়ে দেয়। ভারতীয় হকি-দল এবার অংশ নেবে বার্সেলোনার প্রি-ওলিম্পিক হকি টুর্নামেন্টে, অর্থাৎ ১৯৯৬ সালের আটলান্টা ওলিম্পিকের যোগ্যতা নির্ণায়ক খেলায়। খেলা হবে ১৯-২৮ জানুয়ারি। ভারত ছাড়াও প্রি-ওলিম্পিক হকি টুর্নামেন্টে খেলবে ইংল্যান্ড, হল্যান্ড, মালয়েশিয়া, বেলজিয়াম, বেলারুশ, স্পেন ও কানাডা। রাউন্ড রবিন লিগভিত্তিক এই টুর্নামেন্টের সেরা পাঁচটি দল আটলান্টা ওলিম্পিকের মূল পর্বে খেলার সুযোগ পাবে। ভারতীয় হকির দিক থেকে খুবই গুরুত্বপূর্ণ এই প্রি-ওলিম্পিক টুর্নামেন্ট। গত বছর হিরোশিমা এশিয়াডের ফাইনালে ভারত দক্ষিণ কোরিয়ার কাছে ২-৩ গোলে হেরে যাওয়ায় আটলান্টা ওলিম্পিকে সরাসরি খেলার সুযোগ পায়নি। আটলান্টা ওলিম্পিক হকির মূল পর্বে খেলবে ১২টি দেশ। ইতিমধ্যে সাতটি দেশ ওখানে খেলার ছাড়পত্র পেয়ে গেছে, বিশ্বচ্যাম্পিয়ান পাকিস্তান, বার্সেলোনা ওলিম্পিক ও ইউরোপিয়ান চ্যাম্পিয়ান জার্মানি। এশিয়াডের সোনা জয়ী দেশ দক্ষিণ কোরিয়া, ওশেনিয়া অঞ্চলের চ্যাম্পিয়ান অস্ট্রেলিয়া, আফ্রিকা অঞ্চলের বিজয়ী দেশ দক্ষিণ আফ্রিকা, লাতিন আমেরিকা গ্রুপের চ্যাম্পিয়ান আর্জেন্টিনা ও আয়োজক দেশ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। গত দু'বারও ভারত যথাক্রমে সোল ওলিম্পিক (১৯৮৮) ও বার্সেলোনা ওলিম্পিকের (১৯৯২) মূল পর্বে খেলার সুযোগ পেয়েছিল যোগ্যতা-নির্ণায়ক টুর্নামেন্ট খেলে। একসময় ওলিম্পিক হকিতে দারুণ শক্তিশালী ভারত ইদানীং যোগ্যতা-নির্ণায়ক টুর্নামেন্ট খেলে ওলিম্পিক আসরে নামছে, এই ঘটনা কিন্তু এখনকার ভারতীয় হকির দৈন্যদশাই প্রমাণ করে দেয়। হকি আমাদের গর্বের খেলা। ১৯০০ সালের প্যারিস ওলিম্পিকের দৌড়ের ইভেন্টে নরম্যান প্রিচার্ডের দুটি রুপো এবং ১৯৫২ সালের হেলসিঙ্কি ওলিম্পিক কুস্তির ব্যান্টামওয়েট বিভাগে কে ডি যাদবের একটি ব্রোঞ্জের কথা বাদ

আন্তর্জাতিক হকিতে ভারত কি পারবে ঘুরে দাঁড়াতে

জগবীর সিংহ ফোটো : সন্তোষ ঘোষ

পারগত সিংহ দলে ফিরে আসায় ডিফেন্স-এর শক্তি বেড়েছে

দিলে ওলিম্পিকে আমরা যে ক'টি পদক পেয়েছি (আটটি সোনা, একটি রুপো ও দুটি ব্রোঞ্জ) তা সবই এসেছে ওই হকির সুবাদে। ওলিম্পিক হকিতে ভারত শেষবার পদক (সোনা) পেয়েছিল ও ১৯৮০ সালের মস্কো ওলিম্পিকে এবং বলা বাহুল্য, কয়েকটি শক্তিশালী দেশ এই ওলিম্পিকে আসেনি। বার্সেলোনা ঘুরে ভারতীয় হকি-দল যদি এবার আটলান্টায় যেতে পারে, তা হলে ক্ষীণ হলেও একটা পদকের আশা অন্তত করা যেতে পারে। ওলিম্পিকের অন্য ইভেন্টগুলো থেকে আমাদের পদক জয়ের আশা না করাই ভাল। বিশ্ব-হকির ক্রমপর্যায়ে ভারত এই মুহূর্তে আছে পঞ্চম স্থানে ; জার্মানি, পাকিস্তান, অস্ট্রেলিয়া ও হল্যান্ডের পরে।

এ-কথা সত্যি যে, ডিপ ডিফেন্ডার পারগত সিংহ এবং ফরওয়ার্ড লাইনের খেলোয়াড় জগবীর সিংহ দলে ফিরে আসায় ভারতীয় দলের শক্তি বেড়েছে। রক্ষণভাগে পারগত সিংহ ও অনিল অলড্রিন, দু'জনেই যথেষ্ট অভিজ্ঞ ও দক্ষ খেলোয়াড়। শুধু রক্ষণভাগে ভরসা দিতে নয়, 'পেনাল্টি কর্নার স্পেশ্যালিস্ট' হিসেবেও অনিল অলড্রিন দলে অপরিহার্য এখন। পারগত সিংহের ফর্মে দারুণ সন্তুষ্ট প্রধান কোচ বাসুদেবন ভাস্করন। তাঁর কথায়, "আরও দু' বছর আন্তর্জাতিক হকিতে সুনামের সঙ্গে খেলবে পারগত।" আজলান শাহ ট্রোফিতে স্পেনের আক্রমণের ঢেউ প্রায় একাই তো সামাল দিয়েছিলেন পারগত। পারগতের হাতেই এখন ভারতীয় দলের নেতৃত্ব। পরিবর্ত ডিফেন্ডার রজনীশ মিশ্র এখন পরিণত খেলোয়াড়। একই কথা বলা যায় গোলরক্ষক আশিস বল্লাল সম্পর্কেও। বিশেষ করে পেনাল্টি কর্নার রোখার ব্যাপারে তিনি আগের তুলনায় অনেক অভিজ্ঞ হয়ে উঠছেন। তাঁর চমৎকার ফর্ম ও সপ্রতিভতা দলকে ভরসা দিয়েছে। দলের দু' নম্বর গোলরক্ষক সুব্বাইয়া টাই ব্রেকার-এ পেনাল্টি পুশ 'সেভ' করার ক্ষেত্রে ইতিমধ্যেই সকলের নজর কেড়েছেন। চ্যাম্পিয়ান্স ট্রোফিতে ইংল্যান্ডের বিপক্ষে এবং আজলান শাহ হকির ফাইনালে জার্মানির বিপক্ষে টাই ব্রেকার-এ সুব্বাইয়ার দুর্দান্ত 'সেভ'-ই এনে দিয়েছিল ভারতের জয়।

হরপ্রীত সিংহ

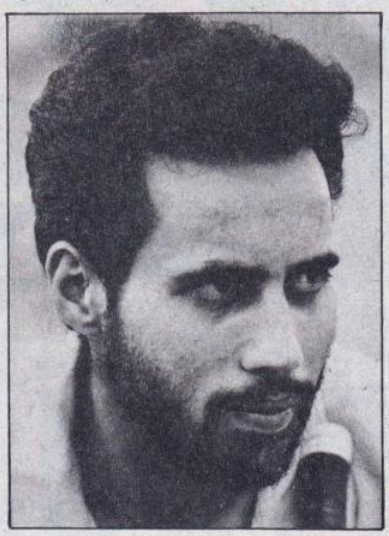

গোলরক্ষক সুব্বাইয়া

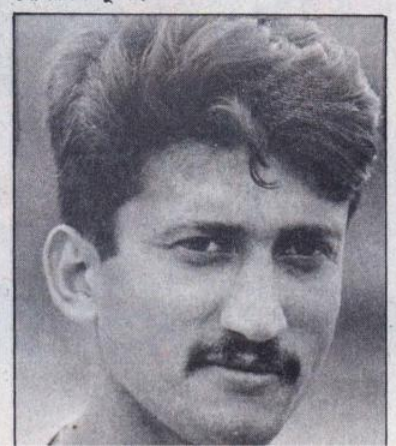

রক্ষণভাগের খেলায়, সব মিলিয়ে ভাল খেলার ধারাবাহিকতা তৈরি হয়েছে। কোচ ভাস্করনের বক্তব্য, "রক্ষণভাগ নিয়ে চিন্তা নেই।" হরপ্রীত সিংহ, মহম্মদ রিয়াজ ও রমনদীপ সিংহকে নিয়ে গড়া ভারতের মাঝমাঠ দলকে আশ্বস্ত করেছে। লেফ্‌ট হাফ রমনদীপ সিংহ ওভারল্যাপিং করতে সিদ্ধহস্ত। বাড়তি ফরওয়ার্ডের কাজটা তিনি করছেন ঠিকমতো। কলকাতার ছেলে বলজিৎ সিংহ মূলত রাইট হাফের খেলোয়াড় হলেও রাইট ইনের জায়গায় নিজেকে মানিয়ে নিয়েছেন। বলজিৎ সিংহ উদ্যমী ও পরিশ্রমী। সারা মাঠ জুড়ে খেলার ক্ষমতা তাঁর আছে। ফরওয়ার্ড জগবীর সিংহ তাঁর ফর্ম ফিরে পেয়েছেন। ফরওয়ার্ড লাইনের অন্য তারকা মুকেশ কুমার তাঁর সুনাম অটুট রেখেছেন। আক্রমণের 'ট্রাম্প কার্ড' মুকেশকুমারই। যে-কোনও বিপক্ষের রক্ষণভাগ সমীহ করে ভারতের এই কুশলী ফরওয়ার্ডটিকে। লেফ্‌ট আউট গেভিন ফেরিরা-র গতি বিপক্ষের কাছে সবসময়ই ভয়ের কারণ। তবে এ-কথা ঠিক যে, ভারতের আক্রমণভাগে ডান দিক যতটা শক্তিশালী, তুলনায় কিছুটা কমজোরি বাঁ দিক। ফরওয়ার্ড লাইনের খেলোয়াড় ধনরাজ পিল্লাই দলে ফিরে এলে দলের শক্তি আরও বাড়বে। রিজার্ভ বেঞ্চও মানানসই। সব মিলিয়ে ভারতীয় হকির ভবিষ্যৎ উজ্জ্বলই।

বড় কোনও অঘটন না ঘটলে ধরে নেওয়া যায়, ভারত প্রি-ওলিম্পিকের বাধা পার হতে পারবে। হল্যান্ড, ইংল্যান্ড ও মালয়েশিয়া ছাড়া বার্সেলোনা আসরে আর কোনও দলের ভারতকে বেগ দেওয়ার শক্তি নেই। অবশ্য চমক দেখাতে পারে কানাডা। আটটি দলের মধ্যে পাঁচটি সেরা দল মূল পর্বে খেলবে। তাই ভারতের সামনে মূল পর্বে উঠে যাওয়ার সুবর্ণ সুযোগ থাকছে। দুটি ম্যাচ জিতলেই 'পারগত ব্রিগেড' আটলান্টায় যাওয়ার সুযোগ পাবে। শক্তি ও পরিস্থিতি, দুটি দিক থেকেই আশা থাকছে। এ ছাড়া আজলান শাহ হকিতে তো দেখা গেছে প্রি-ওলিম্পিকের 'ড্রেস রিহার্সাল'। স্পেন, কানাডা ও মালয়েশিয়া হাজির ছিল ওই টুর্নামেন্টে। বিশ্বকাপের খেলায় ও চ্যাম্পিয়ান্স ট্রোফিতে ভারত হারিয়েছিল ইংল্যান্ডকে। এর আগে দেশের মাটিতে ভারত হারিয়েছিল হল্যান্ডকেও। তাই প্রি-ওলিম্পিক হকিতে ভারত ব্যর্থ হলে তার কারণ খুঁজে পাওয়া কঠিন হবে।

টারজান

এডগার রাইস বারোজ

ভ্যান ডর্নের বাড়ির ভেতরে নিয়ে যাওয়া হল টারজানকে। সেখানে চিরদিনের জন্য টারজানকে রেখে দিতে চান ভ্যান ডর্ন।

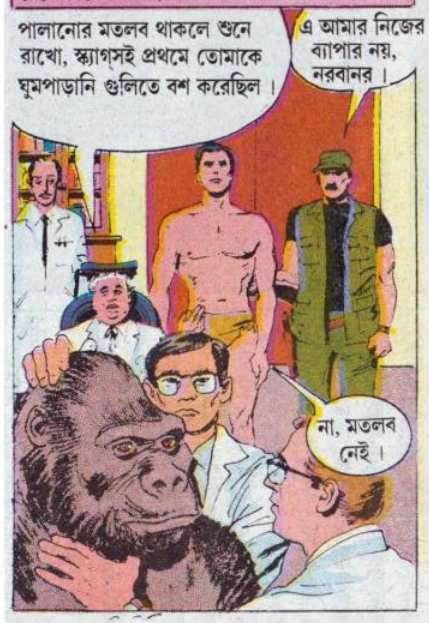

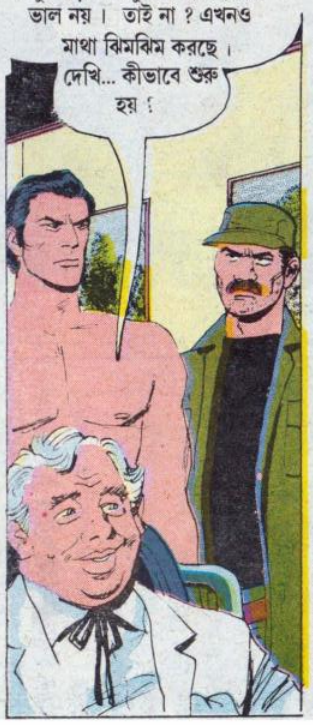

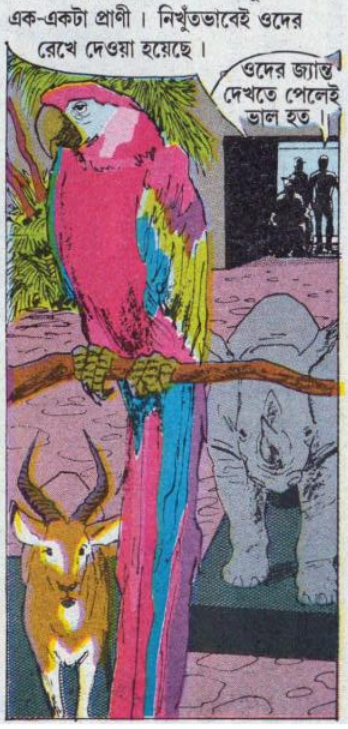

টারজান

এডগার রাইস বারোজ

ভ্যান ডর্নের দ্বীপের বাড়িতে টারজান বুঝতে পারল খুনি এই সংগ্রাহক তাকে নিয়ে কী করার কথা ভাবছে।

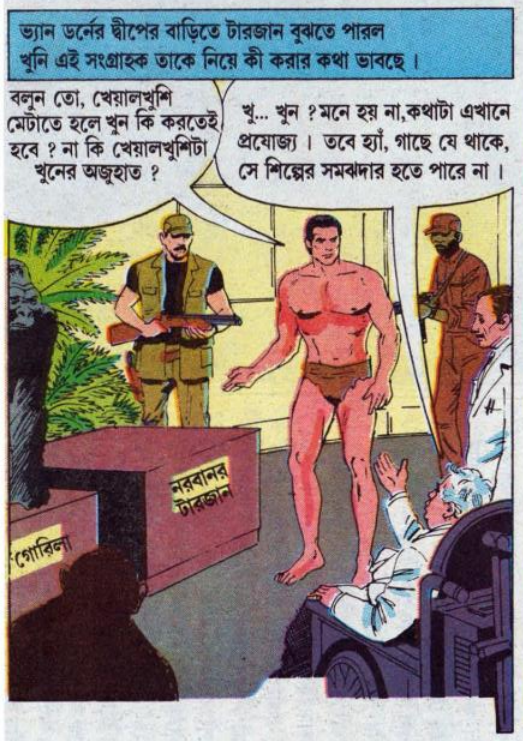

টারজানের খোঁজে ওরা এসে পড়েছে...

(এর পরে আগামী সংখ্যায়)

বিশ্বকাপে হিরওয়ানি

ভারতীয় দলে ফিরেই লেগস্পিনার নরেন্দ্র হিরওয়ানি চমৎকার খেলছেন। তাঁকে নিয়ে লিখেছেন **তানাজি সেনগুপ্ত**

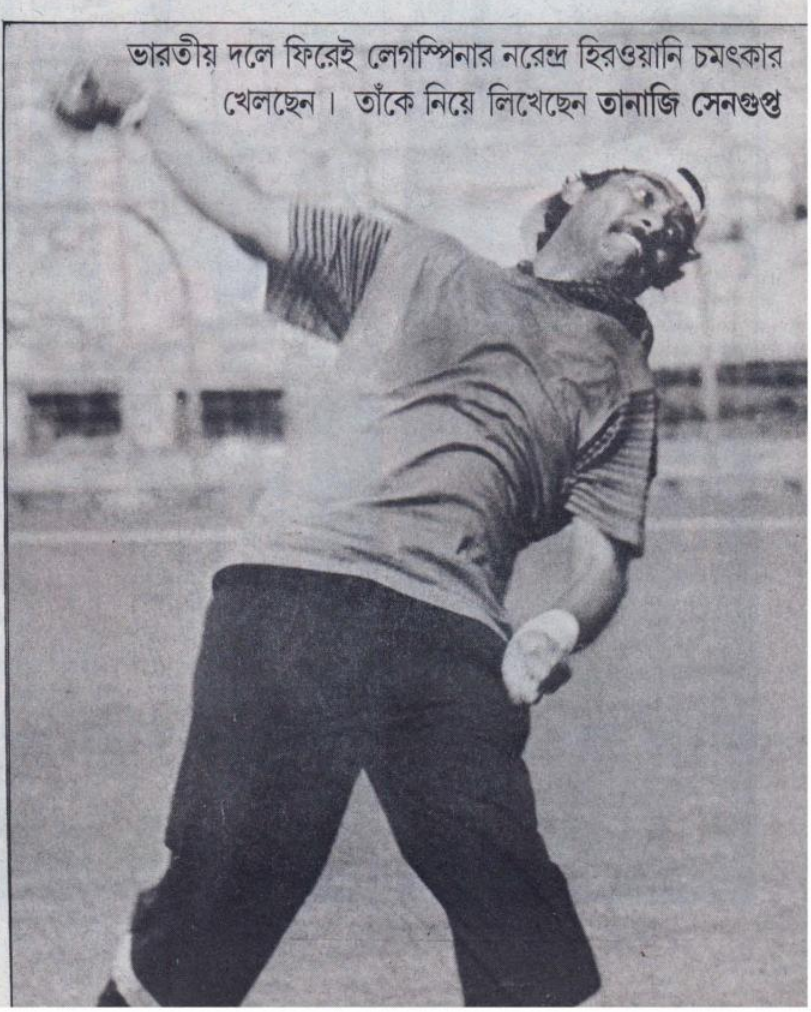

কিছুদিন আগে আলোচনাটি ছিল অনিল কুম্বলে এবং শেন ওয়ার্ন সম্পর্কে। অস্ট্রেলিয়ার ওয়ার্ন না ভারতের কুম্বলে, লেগস্পিনার হিসেবে কে সেরা, তা নিয়ে অনেক জায়গাতেই নানা আলোচনা দেখা গেছে। এখন হঠাৎই এই আলোচনায় ঢুকে পড়েছেন নরেন্দ্র দীপচাঁদ হিরওয়ানি। ভারতের এই স্লো লেগস্পিনারটি যেমন চমৎকার পারফরম্যান্স দেখাচ্ছেন তাতে বিশ্বকাপে তাঁকে ভারতীয় দলে খেলতে দেখা যাবে বলেই বিশেষজ্ঞদের ধারণা। শুধু খেলাই নয়, তাঁদের বিশ্বাস, বিশ্বকাপে ভারতের সেরা অস্ত্রও হতে পারেন হিরওয়ানি।

আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে নরেন্দ্র হিরওয়ানির আবির্ভাব চমক দেখিয়ে। ১৯৮৭-'৮৮ সালে ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে মাদ্রাজে জীবনের প্রথম টেস্টেই বিশ্বরেকর্ড করেন তিনি। আবির্ভাব টেস্টে ১৩৬ রানে ১৬টি উইকেট নেন হিরওয়ানি। এর আগের বিশ্বরেকর্ড ছিল অস্ট্রেলিয়ার ম্যাসির। তিনিও ইংল্যান্ডের বিপক্ষে ১৬টি উইকেট পান, কিন্তু রান দিয়েছিলেন বেশি, ১৩৭। হিরওয়ানি সেই রেকর্ড ভেঙে দেন। তাঁর বোলিং-বৈচিত্র্য দেখে বিশেষজ্ঞরা অবাক হয়ে যান। তারপর থেকে টানা চার বছর হিরওয়ানি ভারতীয় দলে ছিলেন। এবং ভারতীয় দলের প্রধান বোলার হিসেবেই তাঁকে ব্যবহার করা হয়েছে। অনেক গুরুত্বপূর্ণ উইকেট তুলে নেন তিনি। তারপর হঠাৎই হিরওয়ানির ফর্ম খারাপ হতে থাকে। বাজে বল করতে থাকেন তিনি। ফলে ভারতীয় দল থেকে বাদও পড়ে যান এই লেগস্পিনার। ১৯৯০-'৯১ সালে শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে শেষ টেস্ট খেলেন চণ্ডীগড়ে, এর পর ১৯৯১-'৯২ সালে অস্ট্রেলিয়া সফরে গিয়ে একদিনের ম্যাচ খেললেও আর টেস্ট খেলেননি হিরওয়ানি। মাত্র ১৪টি টেস্ট এবং ১৮টি একদিনের ম্যাচ খেলার পরেই তাঁর ক্রিকেট-জীবনে ছেদ পড়ে। টেস্টে তখন পর্যন্ত তাঁর সংগ্রহ ৫৮টি উইকেট, গড় ৩১.০১, একদিনের ম্যাচে পান ২৩টি উইকেট, গড় ৩১.২৬। পাঁচ বছর পর আবার ভারতীয় দলে ফিরে এলেন হিরওয়ানি। নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে কটক টেস্টে দুর্দান্ত বল করেন তিনি। 'ম্যান অব দ্য ম্যাচ' হয়ে প্রত্যাবর্তনের টেস্টটিকে স্মরণীয় করে রাখেন। নিউজিল্যান্ডের প্রথম ইনিংসে হিরওয়ানি পান ৫৯ রানে ছ'টি উইকেট। সবচেয়ে বড় কথা, তাঁর বলের কারিকুরি বুঝতে পারেননি নিউজিল্যান্ডের অনেক বড় ব্যাটস্‌ম্যানও। অর্থাৎ এতদিন পর সমান দক্ষতায় বল করে হিরওয়ানি বোঝালেন, হারিয়ে যাওয়ার জন্য তিনি ক্রিকেট খেলতে আসেননি। নিজেই বলেছেন, "অনেক লড়ে আবার টেস্ট খেলতে পারছি। একসময় এমন কথাও উঠেছিল, হিরওয়ানি বলে ভারতে কোনও লেগস্পিনার আছে নাকি ? কিন্তু আমি হাল ছাড়িনি। প্রবল পরিশ্রম করেছি। লড়াই চালিয়ে গেছি।"

প্রবল পরিশ্রম ও লড়াই করেই ক্রিকেট শিখেছেন নরেন্দ্র হিরওয়ানি। তাঁর জন্ম উত্তরপ্রদেশের গোরক্ষপুরে। কিন্তু সেখানে খেলার তেমন সুযোগ নেই বলে পরিবার-পরিজন সমস্ত কিছু ছেড়ে শুধু ক্রিকেট শেখার জন্যই মধ্যপ্রদেশের ইন্দোরে চলে আসেন তিনি। স্পিন বলের নানা কলাকৌশল শেখেন বিশিষ্ট খেলোয়াড় সঞ্জয় জাগদালের কাছে। থাকতেন স্টেডিয়ামের নীচের একটি ঘরে, একা। সারাদিন শুধু প্র্যাকটিস। এর ফল তিনি পান অবিলম্বে। রনজি ট্রোফিতে সাফল্য আসে। ভারতীয় দলেও সুযোগ পেতে থাকেন নিয়মিত। ভারতীয় দল থেকে বাদ পড়ার পর পরিশ্রম আরও বাড়িয়ে দেন হিরওয়ানি। শেষ তিনটি মরসুমে প্রথম শ্রেণীর ক্রিকেটে যথাক্রমে সাতটি ম্যাচে ৪৭টি উইকেট, ন'টি ম্যাচে ৫৫টি এবং ১০টি ম্যাচে ৪৮টি উইকেট পান। শেষ দু'বারই সানগ্রেস মফতলাল র‍্যাঙ্কিংয়ে ভারতের সেরা বোলারের পুরস্কার পান হিরওয়ানি। এই

ফোটো : সন্তোষ ঘোষ

ভারতের সেরা অস্ত্র হতে পারেন

মরসুমেও চমৎকার ফর্মে আছেন তিনি। সফররত নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে বোর্ড-সভাপতি একাদশের হয়ে দু' ইনিংসেই সাফল্য পাওয়ার পর দলীপ ট্রোফিতেও নিয়মিত উইকেট পান হিরওয়ানি। এর ফলেই ভারতীয় দলে ডাক পান। আবার ফর্ম ফিরে পেলেন কীভাবে হিরওয়ানি ? তাঁর মতে, "বল ডেলিভারির সময় মাথা ঝুঁকে যাচ্ছিল ভুল ভাবে। ফলে বোলিংয়ের সব ধার চলে গিয়েছিল।" এসব টেকনিক্যাল সমস্যা কাটিয়ে উঠতেই তাঁর পুরনো ফর্ম ফিরে এসেছে বলে হিরওয়ানির বিশ্বাস। ভারতের আর-এক লেগস্পিনার অনিল কুম্বলের সঙ্গে নরেন্দ্র হিরওয়ানির তুলনা ইতিমধ্যেই শুরু হয়ে গিয়েছে। হিরওয়ানি যখন ভারতীয় দলের নিয়মিত সদস্য, সেই সময় কুম্বলের টেস্ট ক্রিকেটে আবির্ভাব। ১৯৯০ সালে দু'জনেই ইংল্যান্ড সফরে যান। সেখানেই কুম্বলের টেস্ট অভিষেক। পরবর্তীকালে আস্তে-আস্তে কুম্বলে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করলেও, হিরওয়ানি ক্রমে হারিয়ে যান। দক্ষিণ আফ্রিকায় এবং পরবর্তীকালে দেশের মাটিতে দারুণ বল করেন কুম্বলে। গত মরসুমে ইংল্যান্ডে আলোড়ন ফেলেন সবচেয়ে বেশি উইকেট নিয়ে। ১৬টি ম্যাচে ১০৫টি উইকেট পান তিনি। এখন পর্যন্ত কোনও ভারতীয় বোলারের এই কৃতিত্ব নেই। নিঃসন্দেহে উইকেট নেওয়ায় কুম্বলে অনেকের থেকে এগিয়ে। মাত্র ২১টি টেস্টেই ১০০ উইকেট নেন কুম্বলে। সাফল্য কুম্বলের বেশি, কিন্তু বলের বৈচিত্র্যে এগিয়ে হিরওয়ানি। দু'জনেই লেগস্পিনার, কিন্তু দু'জনে সম্পূর্ণ আলাদা ধরনের, কারও সঙ্গে কারও মিল নেই। কুম্বলে জোরের ওপর লেগস্পিন করেন। অনেকটা প্রাক্তন বিখ্যাত স্পিনার ভাগবত চন্দ্রশেখরের মতো। আর হিরওয়ানি স্লো লেগস্পিনার। তাঁর সঙ্গে মিল আছে অস্ট্রেলিয়ার শেন ওয়ার্ন, পাকিস্তানের আব্দুল কাদির এবং মুস্তাক আহমেদের। হিরওয়ানি ট্র্যাডিশনাল লেগস্পিনার। প্রচুর স্পিন করাতে পারেন। তাঁর হাতে আছে গুগলি, ফ্লিপার, টপস্পিন, লুপ-এর বৈচিত্র্য। কুম্বলের আছে সঠিক নিশানায় বল করার দক্ষতা। তিনি উইকেটের বাউন্সের ওপর নির্ভর করেন। কুম্বলে নিজেই বলেছেন, "আমি অল্প স্পিন করাই, যাতে ব্যাটসম্যান ভাবে বল ঘুরছে।"

বলের বৈচিত্র্য এবং সাফল্য, দু'দিকেই সকলের

আগে কিন্তু অস্ট্রেলিয়ার শেন ওয়ার্ন। ইতিমধ্যেই ৩৮টি টেস্টে ১৭৬টি উইকেট পেয়েছেন তিনি। দেশে-বিদেশে একাই এক-একটি দলকে শেষ করে দিয়েছেন বলের রকমারিত্বে। তাঁর মতো বিধ্বংসী ফর্মে আর কোনও বোলারকেই সাম্প্রতিককালে দেখা যায়নি। কুম্বলেও খুব ভাল বোলার। একদিনের ম্যাচে স্ট্রাইক বোলার হিসেবেও কাজ করেন। কিন্তু ওয়ার্নের মতো একাই দলের বোলিংকে বয়ে নিয়ে যাওয়ার ক্ষমতা নেই। হিরওয়ানি ফিরে এসেই তাঁর দক্ষতা প্রমাণ করেছেন। সব ধরনের বল করার কৃতিত্বও দেখিয়েছেন।

আসন্ন বিশ্বকাপে থাকার সম্ভাবনা সকলের আগে হিরওয়ানিরই। শেন ওয়ার্নকে বারবার কাউন্টি ক্রিকেটে খেলতে অনুরোধ করা হয়েছে। তিনি খেলেননি। তাঁর অধিনায়ক বর্ডারের পরামর্শে নিজের বলের গোপন অস্ত্রগুলি সকলের সামনে দেখানোর ঝুঁকি নেননি। ওয়ার্নের মতোই হিরওয়ানিও এখনও অনেকের কাছে অচেনা। তাঁকে একমাত্র নিউজিল্যান্ডের খেলোয়াড়রাই খেলেছেন। কাউন্টি খেলায় কুম্বলে পরিচিত। তাঁর বলের বৈচিত্র্যও কম। ওয়ার্নের বলের বৈচিত্র্য থাকলেও এই উপমহাদেশে তাঁর সাফল্য কম। হিরওয়ানি খেলবেন পরিচিত পরিবেশে। সুতরাং সবদিক থেকে আসন্ন বিশ্বকাপে লেগস্পিনারদের লড়াইয়ে নরেন্দ্র হিরওয়ানিরই প্রথমে থাকার কথা। এবং এই লড়াইটি যে বেশ উপভোগ্য হবে, এতে কোনও সন্দেহ নেই।

গাবলু
DON TRACHTE

গাবলু
DON TRACHTE

বদন করা হচ্ছে
COTY
VitaCare
নার স্বাস্থ্য ঝলমল, লাবণ্যময়, র ত্বকের দিকে যখন সবাই মুগ্ধ তাকিয়ে দেখে - আনন্দ-বিস্ময় া এক অদ্ভুত শিহরণ ছড়িয়ে দেহে মনে। তাই না ? কোটি াকেয়ার আপনার ত্বককে আরো র করে তোলে - স্বাস্থ্যের অনুপম প্তিতে।
মাত্র কোটি ভিটাকেয়ার শ্চারাইজারেই আছে াসোমস্ - যা হল ভিটামিন ,E এবং প্রো-ভিটামিন B5-এর বিশেষভাবে প্রস্তুত সুষম বেশ। যা ত্বকের গভীর গুলোতেও অনায়াসে পৌঁছে ভিটামিনের পুষ্টি। তাই পনাকে দেখায় আরো স্থ্যাজ্জ্বল, আরো তরুণ ... যে ণ্য বজায় থাকে বহু সময় ধরে। তারুণ্য ও সৌন্দর্যের স্পর্শে আপনাকে যখন অপরূপ ায়, তখন মনটাও যে হয়ে ওঠে ীব, অপরূপ।
াটি ভিটাকেয়ার।
কের স্বাস্থ্যই ত্বকের সৌন্দর্য।
B5 A C E
COTY
VitaCare
COTY
VitaCare
COTY
VitaCare
COTY
VitaCare
DEEP PENETRATING
WINTER MOISTURISER
COTY
VitaCare
ভিটাকেয়ার সম্ভারে আছে ঃ
ক্লিনজার্স (ক্লিনজিং কনসেন্ট্রেট, ক্লিনজিং ফোম),
টোনার এবং ময়শ্চারাইজার্স

যে খা নে যা হ চ্ছে

ডিজিটাল স্টান্টম্যান

• সিনেমায় নায়ক বা খলনায়কের নানারকম রোমহর্ষক কাণ্ডকারখানা, বিপজ্জনক 'অ্যাকশন', মারপিট ইত্যাদি সাধারণত নায়ক বা খলনায়কের চরিত্রাভিনেতারা করেন না, এ গুলো করানো হয় অন্য লোককে দিয়ে। যাদের বলা হয় 'স্টান্টম্যান'। কিন্তু এখন কম্পিউটারভিত্তিক প্রযুক্তিতে নায়কের ছোটখাটো অ্যাকশনকেও অনেক বাড়িয়ে দেখানো যায়। যেমন, নায়ক হয় লাফ দিল তিন ফুট, সেই লাফকে ১০ গুণ বাড়িয়ে ৩০ ফুট করা যায়, আর চমকে দেওয়া যায় দর্শকদের।

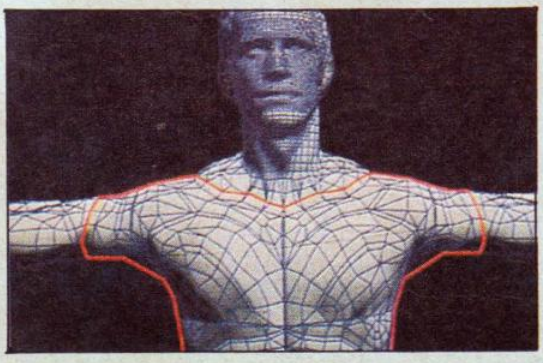

অর্থাৎ স্টান্টম্যানের কাজটা আরও চমকপ্রদভাবে করে দিচ্ছে কম্পিউটার ; তাই একে বলা হচ্ছে 'ডিজিটাল স্টান্টম্যান'। এই পদ্ধতি সিনেমায় এসেছে 'ভিডিও গেম' থেকে। এবং খুব বেশিদিন আগে নয়। কলকাতায় এসেছিল 'ব্যাটম্যান ফর এভার' নামে সকলের দেখার মতো একটি দারুণ অ্যাকশন ছবি। 'অ্যাক্লেম এন্টারটেনমেন্ট' নামে একটি মার্কিন সংস্থা, যারা দুর্দান্ত অ্যাকশন-ভিত্তিক সব ভিডিও গেম তৈরি করে, এই ছবির প্রযোজক 'ওয়ার্নার ব্রাদার্স'-এর সঙ্গে হাত মিলিয়ে তারা সৃষ্টি করেছে নায়ক ব্যাটম্যানের জন্য কিছু চমকপ্রদ ডিজিটাল অ্যাকশন। এ-ক্ষেত্রে একসঙ্গে ১৬টি ক্যামেরায় ধরা হয় নায়কের ছোটখাটো অ্যাকশন। নায়কের শরীরে বিভিন্ন জায়গায় লাগানো শতাধিক ছোট-ছোট প্রতিফলককে কাজে লাগিয়ে তার বিভিন্ন অঙ্গের নড়াচড়ার সঙ্গে-সঙ্গে হাড় এবং পেশির চালচলন নিখুঁতভাবে ধরা হয়। এর পর সেইসব চিত্র-তথ্য বিশেষ ধরনের 'সফ্‌টওয়্যারের' সাহায্যে বিশ্লেষণ করে পাওয়া যায় অভিনেতার 'বডি মুভমেন্ট'-এর খুঁটিনাটি যাবতীয় তথ্য।

অ্যাক্লেম এন্টারটেনমেন্টে'র প্রেসিডেন্ট রবার্ট হোম্‌স-এর কথায়, "এ থেকে নায়কের ছোট অ্যাকশনকে আমরা বাড়িয়ে দিতে পারি। নায়ক যদি একটা পা তোলে, দীর্ঘকালীন গবেষণায় তৈরি এই সফ্‌টওয়্যার বলে দেয় তার দেহের কোন পেশি সক্রিয় হচ্ছে এবং তার দরুন শরীরের অবশিষ্ট অংশই বা কীভাবে প্রভাবিত হচ্ছে। এ বার কম্পিউটারের সাহায্যে তিন ফুট লাফের জন্য তার 'মুভমেন্ট'-কে ৩০ ফুটের উপযোগী করে তোলা যায় সহজেই। একই পদ্ধতিতে কোনও 'মডেল' বা রোবটেও ইচ্ছেমতো অ্যাকশন সৃষ্টি করা যায়।

হিরের চিপ

• হিরের আংটি বা হিরের গয়না ধনীদের বিলাসদ্রব্য। হিরে কাচ কাটার কাজেও লাগে। কিন্তু হিরে দিয়ে কম্পিউটার চিপ ? কয়েকজন বিজ্ঞানী ও প্রযুক্তিবিদ বলছেন, হিরের খুব পাতলা পাত দিয়ে চিপ তৈরি করলে তা থেকে আরও দ্রুতগতির কম্পিউটার তৈরি করা যাবে। কারণ, প্রথমত হিরে খুব ভাল তাপ নিরোধক, রাসায়নিকভাবে নিষ্ক্রিয় এবং এর তাপ পরিবাহিতা তামার চেয়ে চার গুণ বেশি। এর ফলে প্রযুক্তিবিদরা হিরের পাতলা পাতে সিলিকন পাতের তুলনায় অনেক বেশি 'ট্রানজিস্টার' চেপে বসাতে পারবেন, এর দরুন উদ্ভূত বাড়তি তাপ কোনও অসুবিধের সৃষ্টি করতে পারবে না। চিপে

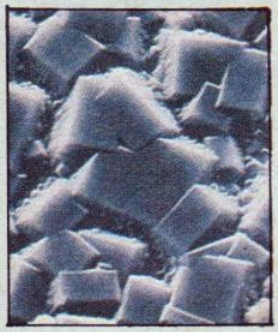

বেশি ট্রানজিস্টার ধরিয়ে কম্পিউটারের গতি বাড়ানোর ক্ষেত্রে এই তাপই সবচেয়ে বড় সমস্যা। হিরে খুব তাড়াতাড়ি তাপকে বের করে দেবে, উচ্চ পরিবাহিতার জন্য। এ ছাড়া, নিজেও সহজে গরম হবে না। উপরন্তু, এও দেখা গেছে যে, হিরের মধ্যে ইলেকট্রনের গতি, সিলিকনের তুলনায় বেশি। উয়োবার্নের 'অ্যাপ্লায়েড সায়েন্স টেকনোলজি কর্পোরেশন'-এর প্রযুক্তিবিদরা ১০ বর্গ সেন্টিমিটার মাপের হিরের 'ওয়েফার' দিয়ে 'সার্কিট বোর্ড' তৈরি করছেন, যা দিয়ে ছোট আকারের 'সুপারকম্পিউটার' তৈরি হবে। (ছবিতে যে পাতলা হিরের পাত দেখা যাচ্ছে, তা আসলের তুলনায় তিন হাজার গুণ বিবর্ধিত)।

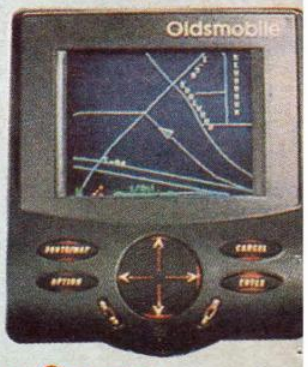

গাড়ির জন্য দিকদর্শক

• গাড়িতে ব্যবহার করার জন্য একটি 'ইলেকট্রনিক নেভিগেটর' বা 'দিকদর্শক যন্ত্র' তৈরি করেছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের 'জেক্সেল' সংস্থা। যন্ত্রটি উন্নীত করেছে 'ওল্ডসমোবাইল'। এতে যে 'গাইডেন্স সিস্টেম' আছে তা সামনের-পেছনের গাড়ির অবস্থান এবং গন্তব্য পথের খুঁটিনাটি মানচিত্র পরদায় নির্দেশ করে। চালকের পক্ষে গাড়ি চালানো অনেক সহজ ও নিরাপদ হয়ে ওঠে। যন্ত্রটির দাম ২০০০ ডলার।

জল তাড়ানো প্রলেপ

• জাপানি বিজ্ঞানীরা এমন একটি 'কোটিং' বা প্রলেপ উদ্ভাবন করেছেন, জলকে যা বিকর্ষণ করে। কোনও বস্তুর ওপরে এই প্রলেপ দিলে তাতে জল দাঁড়াবে না। যেমন দাঁড়ায় না মোমের প্রলেপ দিলে। নিপ্পন টেলিগ্রাফ কর্পোরেশনের যে বিজ্ঞানীরা এটি

তৈরি করেছেন তাঁদের দাবি, বাজারের আর পাঁচটা জল-বিকর্ষক প্রলেপের তুলনায় এটি বেশি কার্যকর। কারণ এর ওপরে জল পড়ামাত্র দ্রুত বিকর্ষণ ক্রিয়ায় প্রায় গোল বিন্দুতে পরিণত হয়ে জল সহজেই গড়িয়ে পড়ে যায়। কোনও 'ফ্ল্যাট সারফেস' অর্থাৎ 'চ্যাটালো তল'-এর ওপর বৃষ্টির জল পড়লে প্রথমত অভিকর্ষজ টান এবং দ্বিতীয়ত জলের অণু ও তলের অণুর পারস্পরিক আকর্ষণের ফলে জলবিন্দুগুলি চ্যাপটা হয়ে গিয়ে তলটির গায়ে বেশি করে লেগে যায়, গড়িয়ে পড়তে পারে না। কিন্তু চ্যাটালো তলে ওই প্রলেপ দেওয়া থাকলে তল ও জলের অণুর মধ্যে আকর্ষণ অত্যন্ত দুর্বল হয়ে পড়ে এবং

জলবিন্দুগুলি অভিকর্ষের টান খানিকটা কাটিয়ে উঠে প্রায় বর্তুল আকার নেয় এবং তার ফলে তল থেকে অনেক সহজেই গড়িয়ে পড়ে। অর্থাৎ তলের ওপরে আর জল দাঁড়াতে পারে না। নতুন এই প্রলেপের দাম বাজারচলতি 'কোটিং'-এর তুলনায় অনেকটাই বেশি। তবে টিভির ডিশ অ্যান্টেনায় জল বা তুষার লেগে থাকায় সঙ্কেত গ্রহণে যে অসুবিধে দেখা দেয় এই প্রলেপ ব্যবহার করলে তা আর হবে না। এ ছাড়া, উদ্ভাবকরা বলেছেন, জাহাজের বাইরের দিকে এই কোটিং দিলে জলের সঙ্গে ঘর্ষণজনিত বাধা অনেক কমে যাওয়ায় জাহাজের গতি যেমন বাড়বে, জ্বালানিও পুড়বে তুলনায় কম।

ফোনের রক্ষাকবচ

• 'টেলি-স্ক্রিন' সংস্থার তৈরি 'ফোন প্রোটেক্টর' যন্ত্র সত্যিই টেলিফোনের রক্ষাকবচ হিসেবে কাজ করে। অনেক সময়েই দেখা যায় অজ্ঞাত কোনও লোক কাউকে বিরক্ত বা উত্ত্যক্ত করার জন্য ভুতুড়ে ফোন করছে। 'ফোন প্রোটেক্টর' ওই ভুতুড়ে 'কল' আসতেই দেবে না। ফোনের মালিক একটি চার অঙ্কের সাঙ্কেতিক সংখ্যা জানিয়ে রাখবেন তাঁর সম্ভাব্য পরিচিত মানুষদের। কল আসা মাত্র কম্পিউটার কণ্ঠ বারবার বলতে থাকবে সেই সাঙ্কেতিক সংখ্যাটি 'ডায়াল' করতে। লোকটি যদি তা না পারে তা হলে প্রোটেক্টর ফোনের সংযোগ বিচ্ছিন্ন করে দেবে। ফোনে আর 'রিং' হবে না। এই যন্ত্রের সাহায্যে টেলিফোনকে সাময়িকভাবে নিষ্ক্রিয়ও করে রাখা যায়, যাতে জরুরি কোনও কাজ, খাওয়া দাওয়া বা পড়াশোনার সময় কোনও টেলিফোন না আসতে পারে। এই যন্ত্রের সঙ্গে একটি 'কি-প্যাড'ও থাকে, যার সাহায্যে প্রয়োজনমতো সাঙ্কেতিক সংখ্যা বা কোড বদলানো যায়। যন্ত্রটির দাম প্রায় ৪৫ ডলার।

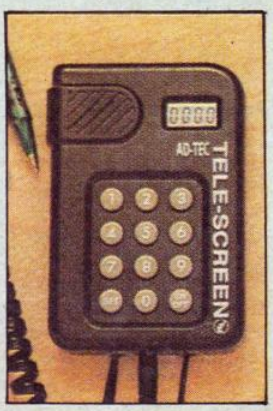

পিসি-টিভি

• কম্পিউটারে কাজ করতে করতে যদি দম ফেলার জন্য একটু টিভি বা ভিডিও দেখতে ইচ্ছে হয়, তা হলে আলাদাভাবে আর টিভি বা ভিডিও সেট না রাখলেও চলে। মার্কিন এবং জাপানি কম্পিউটার নির্মাতারা এমন সব যন্ত্র বের করছে, যা একই সঙ্গে কম্পিউটার এবং টিভি। এটা প্রথম বের করে আমেরিকার 'অ্যাপ্‌ল' সংস্থা। এর পর 'গ্যাকার্ড বেল', 'কমপ্যাক' ইত্যাদি সংস্থাও বের করেছে। জাপানের 'ন্যাশনাল প্যানাসনিক'-এর 'পিসি-টিভি'ও বেরিয়ে গেছে। এ-ধরনের পিসি-র সঙ্গে যুক্ত থাকে 'টিভি-টানার', যার সাহায্যে ধরা যায় বিভিন্ন 'চ্যানেল'। 'কেবল-টিভি লাইন'-এর সঙ্গেও সংযোগ করা যায়। এ-ধরনের পিসি-তে সাধারণ টিভি-র ছবি আসে পরদার এক কোণে একটি ছোট ফ্রেমে। তবে প্রয়োজনে ফ্রেমটি বাড়িয়ে পরদার সমান করেও নেওয়া যায়।

কম সময়ে রক্ত-পরীক্ষা

• মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের 'বেইলর কলেজ অব মেডিসিন' এমন এক ধরনের রক্ত-পরীক্ষা পদ্ধতি বের করেছে, যাতে প্রচলিত রক্তের 'এনজাইম' নির্ণায়ক পরীক্ষার তুলনায় সময় লাগবে অনেক কম। প্রচলিত পদ্ধতিতে যেখানে ১২ থেকে ১৪ ঘণ্টা সময় লেগে যায়, সেখানে কম্পিউটারভিত্তিক এই বেইলর পদ্ধতিতে দু' ঘণ্টারও কম সময়ে পরীক্ষার ফল মিলবে। আমেরিকার বহু হাসপাতালে এই পদ্ধতি চালু হয়ে গেছে। এটির দাম ৭০ ডলার।

বিমল বসু

এবার নিন আউটান, এক অন্তর্রাষ্ট্রীয় লোশন যা মশাদের জন্য নিয়ে এ'ল এক ছোট্ট খবর

বিদায়

আউটান একটও তেলতেলে নয়, এমন কি চটচটেও নয়, চটপট কাজ করে এক স্বচ্ছ লোশন-যাতে রয়েছে সুন্দর মৃদু সুগন্ধ ... **এ**টি চটপট শুকিয়ে গিয়ে আপনাকে এক অদৃশ্য মশারী দিয়ে ঢেকে দেয়-   ব্যস্ আপনি ৮ ঘন্টার মতো নিশ্চিন্ত। **এ**টি আপনার ত্বকের জন্য কোমল আর ধোয়াও যায় অতি সহজে। **সা**রা বিশ্বে সেই কোলোন থেকে কলকাতা পর্যন্ত,   আউটান মশাদের দূর করতে সক্ষম হয়েছে। **তা**ই আজ আউটান নিয়ে আসুন। **আ**জ রাতেই ব্যবহার করুন আর দেখুন মশারা কেমন সদলবলে পালায়।

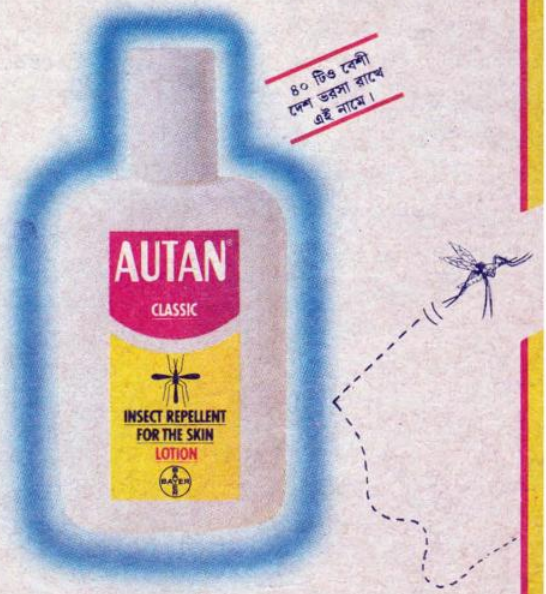

এমন দারুণ উপায়
মশারা সদলবলে পালায়।

Bayer

বাছাই করা শহরগুলিতে পাওয়া যাচ্ছে।

R K SWAMY/BBDO BIL 4736/BN

হরিপুরের হরেক কাণ্ড

শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়

দুই

বৃষ্টি, বাতাস আর শীতের মধ্যেও শূলপাণির বাড়িতে বিস্তর মেয়ে-পুরুষ জড়ো হয়ে গেল। টর্চ, লণ্ঠন, হ্যাজাকবাতির অভাব হয়নি।

সামনে একটু ফাঁকা জায়গায় আগাছা জমে আছে। আগে বাগান ছিল। শূলপাণির বাগানটাগানের শখ নেই। পেছনে সরলা বুড়ির পুরনো বাড়ি। দরজার পাল্লা হাট করে খোলা। শেকলে বাঁধা কুকুরটা প্রাণপণে চেঁচাচ্ছে।

নগেন প্রাক্তন দারোগা হলেও তারই অধিকার বেশি। সে সকলের দিকে ফিরে গমগমে গলায় বলল, "ভ্রাতা ও ভগ্নীগণ, আপনারা কেউ ভেতরে যাবেন না। আমি আগে ঢুকে দেখি কী হয়েছে। যদি বিপজ্জনক কিছু ঘটে থাকে, ধরুন যদি কোনও খুনি শূলপাণিকে খুন করে ভেতরে ওত পেতে থাকে, কিংবা যদি কোনও বাঘ শূলপাণিকে খেয়ে ভেতরে এখনও বসে ঠোঁট চাটতে থাকে, কিংবা কোনও ভূত যদি—আচ্ছা, ভূতের কথা থাক। মোটকথা, আমি আগে শূলপাণির ঘরে ঢুকছি।"

নয়ন বলে উঠল, "কিন্তু আপনার তো পিস্তল নেই।"

নগেন কাঁধ ঝাঁকিয়ে বলল, "তাতে কী? আমার দুটো চোখই জোড়া পিস্তলের সমান। এই গদাইকেই জিজ্ঞেস করো না, কোনওদিন চোখে চোখ রেখে কথা কয়েছে?"

"কিন্তু খুনির কাছে পিস্তল থাকতে পারে তো নগেনবাবু?"

নগেন দারোগা হো হো করে হেসে উঠে বলল, "পারেই তো, আর সেইজন্যই আমি সবার আগে ঢুকতে চাইছি। দেশের জন্য প্রাণ দেওয়ার ইচ্ছে আমার অনেকদিনের। দারোগাগিরি করে-করে আর সেটা হয়ে ওঠেনি। যদি সুযোগ এসেই থাকে তবে হাসিমুখেই প্রাণ দেব। তোমরা বটতলায় আমার নামে একটা শহিদ বেদি বানিও।"

গদাই নস্কর ফিচিক ফিচিক হাসছিল। চাপা গলায় বলল, "আর লোক হাসিও না বাপু। চক্করপুরের জঙ্গলে আমার শাগরেদ কেলো বাঘের ডাক ডেকেছিল বলে তুমি ভয় খেয়ে কী পাঁই পাঁই করেই না ছুট দিয়েছিলে!"

নগেন বিরক্ত হয়ে বলল, "আচমকা ডেকে ওঠায় ভয় পেয়েছিলুম ঠিকই, কিন্তু বাঘের ভয় থাকলেও আমার ভালুকের ভয় নেই।"

"বাঘের চেয়ে ভালুক আরও খারাপ। পাল্লায় পড়োনি বলে বলছ। বাঘ সবসময়ে তেড়ে আসে না, আর ভালুকের স্বভাবই হল কথা নেই বার্তা নেই তেড়ে এসে থাবা মারার। অ্যাই বড়-বড় নখ, বুঝলে?"

নগেন খুব বিরক্তির সঙ্গে বলে, "ভালুকের গল্প পরে হবে, হাতে জরুরি কাজ রয়েছে। চলো, ঘরে ঢুকে দেখা যাক।"

"কে আগে ঢুকবে? তুমি, না আমি?"

নগেন বলল, "টস করা যাক।"

গদাই হেসে বলল, "তার দরকার নেই। তুমি রিটায়ার করার সঙ্গে-সঙ্গে সরকার বাহাদুর তোমার পিস্তল নিয়ে নিয়েছেন। আমার তো সে বালাই নেই। আমার পেটকোঁচড়ে সবসময়ে পিস্তল থাকে। তবে পিস্তলের দরকার হবে না। খুনি হোক, বাঘ হোক, এত লোক দেখে সে বসে নেই। এসো।"

গদাই ভেতরে ঢুকে চারদিকে টর্চ ফোকাস করে বলল, "ওহে নগেন, ব্যাপার সুবিধের নয়।"

টর্চের আলোয় যা দেখা গেল তা সুবিধের ব্যাপার নয় ঠিকই। শূলপাণির ঘর একেবারে লণ্ডভণ্ড। ঘটিবাটি বিছানা বাক্স সব ছত্রাকার ছড়িয়ে আছে। বানরটা ঘরের উঁচু একটা তাকে উঠে বসে আছে। ঘরের কোণে বসে বেড়ালটা ফ্যাঁস-ফ্যাঁস আওয়াজ ছাড়ছে। সড়ালে কুকুরটা কোনও কালে বাঁধা থাকে না। সেটা আজ নতুন একটা চেন দিয়ে ভেতরের দরজার কড়ার সঙ্গে বাঁধা। চেঁচিয়ে-চেঁচিয়ে বেচারার গলা ভেঙে গেছে। গাঁয়ের লোক দেখে সে নিজস্ব ভাষায় নানারকম নালিশ জানাতে লাগল।

নগেন বলল, "শূলপাণি কি খুন হল নাকি হে গদাই?"

"আগেই খুন ধরে নিচ্ছ কেন? রক্তপাত তো হয়নি দেখছ?"

"আহা, গলায় ফাঁস দিয়ে যদি—"

"তা হলে লাশ যাবে কোথায়?"

"সরিয়ে ফেলেছে।"

"কেন সরাবে?"

"প্রমাণ লোপ করার জন্য।"

"নাঃ, তুমি দারোগা হলেও বুদ্ধি খাটাচ্ছ না, লাশ সরানোর পরিশ্রম কম নয়। বিশেষ কারণ না থাকলে কেউ একটা ডেডবডি কাঁধে করে নিয়ে যায় না, ফেলেই যায়।"

ব্যঙ্গের হাসি হেসে নগেন বলল, "তাই বটে! এসব তো তুমি ভালই

হাসিখুশি

তরুণ কবি সম্পাদকের কাছে কবিতা পাঠিয়েছেন ছাপার জন্য। সঙ্গে চিঠি : "কবিতাটায় কমা, সেমিকোলন, বিস্ময়-চিহ্ন এসব কিছুই দিইনি। কবিতাটা ছাপতে দেওয়ার সময় যেমন যেমন লাগবে আপনি দয়া করে বসিয়ে নেবেন।" কবিতায় না আছে ভাব, না আছে ভাষা। মাথামুণ্ডুহীন এই রচনাটি ছাপার অযোগ্য। কিন্তু সজ্জন সম্পাদক কবিকে খুব মোলায়েম ভাষায় চিঠি লিখে জানালেন, "এর পর আপনি কমা, সেমিকোলন, পূর্ণচ্ছেদ,এগুলো যত্ন করে পাঠিয়ে দেবেন। কবিতাটা আমরাই লিখে নেব।"

❑

"পরশু থেকে দেখছি, তুই সারাক্ষণ কোমরে দড়ি জড়িয়ে ঘুরছিস। কী ব্যাপার বল তো বাবাই ?"

"এরই মধ্যে তুমি সব ভুলে গেলে মা ? তুমি তো সেদিন বললে, পরীক্ষার আর দেরি নেই, এবার কোমর বেঁধে লেগে পড়ো।"

❑

"দরজায় অত বড়-বড় করে লেখা আছে, 'অনুমতি ছাড়া দেখা করা নিষেধ'—দেখেননি ?"

"দেখেছি বইকী !"

"তা হলে ভেতরে এলেন যে ?"

"আমি তো আপনার সঙ্গে দেখা করতে আসিনি, এসেছি আপনার অনুমতি আদায় করতে।"

❑

হরিধ্বনি দিতে-দিতে কয়েকজন যুবক যাচ্ছে রাস্তা দিয়ে। এক পথচারী স্কুলের একটি ছাত্রকে জিজ্ঞেস করলেন, "কে মারা গেল' ভাই ?"

ছেলেটি কিছুক্ষণ আমতা-আমতা করল। তারপর বলল, "ঠিক বলতে পারব না কাকু, তবে মনে হচ্ছে খাটিয়ায় যিনি শুয়ে আছেন, তিনিই মারা গেছেন।"

❑

"শালটা সত্যিই সুন্দর। কিন্তু এখানে কে এমন বেকুব আছে যে ওটা নগদ পাঁচ হাজার টাকা দিয়ে কিনবে ?"

"ঠিক বলেছেন। আমরা ঠিক এটাই দেখতে চাইছি।"

জানো। অনেক করেছ কি না, তাই অভিজ্ঞতা থেকেই বলছ।"

"অভিজ্ঞতার চেয়েও বড় কথা হল কমন সেন্স। তার জন্য মাথা খাটানো চাই। তুমি আস্ত পাঁঠা বা দেড়খানা পাকা কাঁঠাল খেতে পারো বটে, কিন্তু মস্তিষ্কচালনা তোমার একেবারে নেই। পেটের ব্যায়ামই হয়েছে, মাথার ব্যায়াম হয়নি। যদি তাই হত তা হলে দু'-দু'বার তোমার গরাদে থেকে আমি পালিয়ে যেতে পারতাম না।"

"অত বাহাদুরি কোরো না। আমার ফোর্সের মধ্যেও তোমার লোক ছিল। তারাই তোমাকে পালানোর পথ করে দিয়েছিল।"

"সেটা ধরতে তোমার এতদিন সময় লাগল কেন ? যাকগে, এখন এসো, শূলপাণির ঘরদোর ভাল করে দেখে পরিস্থিতিটা খতিয়ে দেখা যাক।"

একটু কাঁপা গলায় পেছন থেকে ভূতনাথ বলে উঠল, "দেখার কিছু নেই ভায়া। আমি সেই কবেই শূলপাণিকে বলেছিলুম, 'ওরে শূল, ভূতপ্রেত ধরে অধর্ম করিস না। ওরাই একদিন তোর ঘাড় মটকাবে।' সেই কথাই ফলে গেল।"

ভিড় ঠেলে জটেশ্বর তান্ত্রিক এগিয়ে এসে বলল, "ক'টা ভূত ছিল শুনি শূলপাণির ? সব গাঁজাখুরি গল্প। এ-গাঁয়ের সব ভূত শ্মশানকালী মন্দিরের বট আর অশ্বত্থগাছে ঝুলে আছে। আমি গুণে দেখে এসেছি একটু আগে। মোট সাতশো তিরানব্বইটা। এ-গাঁয়ে ও- ক'টাই আছে। তাও চারশোর ওপর হচ্ছে বহু পুরনো ভূত। তাদের কারও-কারও বয়স হাজারের ওপরে। ঝুরঝুরে চেহারা, আবছা হয়ে এসেছে, তারা সাতে-পাঁচে থাকেও না। ভূতের নামে খবর্দার বদনাম দেবেন না।"

ভূতনাথ রামনামটা একটু থামিয়ে কাঁদো-কাঁদো গলায় বলল, "বদনাম করিনি বাপু, পাঁচজনে বলছিল আর কি।"

বৈষ্ণব গোপেশ্বর দাস জটেশ্বরের পিছু-পিছু এসে মিষ্টি করে বলল, "শূলপাণি কি কৃষ্ণে লীন হয়েছেন ? এখানে এত গোল কেন ?"

গোপেশ্বর বিনয়ী হলেও চতুর লোক। গাঁয়ের সবাই তাকে সমঝে চলে। পবনকুমার তার দিকে চেয়ে ভ্রূ কুঁচকে বলল, "শূলপাণি কৃষ্ণে লীন হলে তোমার সুবিধেটা কী বলো তো !"

"হরি হরি। আমার সুবিধে হবে কেন ? জীবাত্মা যদি পরমাত্মায় মিলে গিয়ে থাকে তা হলে তো ভাল কথাই।"

"না, ভাল কথা নয়। এ-গাঁয়ের অনেকের ধারণা আছে যে, সরলাবুড়ির গুপ্তধন ছিল, আর সেই গুপ্তধনের সন্ধান সে শূলপাণিকে দিয়ে গেছে। সেই ধারণার বশবর্তী হয়ে যদি কেউ তার কাছ থেকে গুপ্তধনের সন্ধান আদায় করার জন্য গুম করে থাকে, তা হলে আশ্চর্য হব না। গোপেশ্বর তোমাকে পরশুদিন দেখেছি বটতলায় বসে জটেশ্বরের সঙ্গে শূলপাণির গুপ্তধন নিয়ে কথা কইছিলে।"

রাজদ্রোহী পবনকুমারকে সবাই একটু ভয় খায়। এক সময়ে দুরন্ত পবনকুমারের দাপটে সবাই থরহরি ছিল।

গোপেশ্বর মিনমিন করে বলল, "সবাই বলে, আমরাও বলি। দোষের তো কিছু নয়। বিষয় আশয়ে ডুবে থাকে জীব, সেই নিয়েই কথা হয়। তবে শূলপাণির কী হয়েছে তা আমাদের জানা নেই।"

বজ্র সেন বলল, "ভূতপ্রেত নয়, গুপ্তধনও নয়। আমি ভাল করেই জানি, শূলপাণি একজন ছদ্মবেশী বৈজ্ঞানিক। একদিন দুপুরে আমি এ-বাড়ি থেকে নীল আর লাল ধোঁয়া বেরোতে দেখেছি।"

গাঁয়ের উটকো লোক রাখাল বলল, "আমি সবুজ ধোঁয়াও দেখেছি।"

বজ্র সেন বলল, "মনে হয় শূলপাণিকে আমরা ঠিক চিনতে পারিনি। তার কোনও বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের জন্যই তাকে তুলে নিয়ে গিয়েছে কেউ।"

নগেন দারোগা বলল, "ওসব আষাঢ়ে গল্প।"

সুধীর ঘোষ বলল, "আচ্ছা দারোগাবাবু, শূলপাণির কি ঘড়ি ছিল ?"

"জানি না।"

কয়েকজন একসঙ্গে বলে উঠল, "ছিল না ! ছিল না !"

সুধীর বলল, "ঘড়ি ? যদি ছিল না, তা হলে শূলপাণি কী করে রাত আটটা বাজলে টের পেত আর হেসে উঠত বলুন তো !"

নগেন দারোগা খেঁচিয়ে উঠে বলল, "তার আমি কী জানি ?"

সুধীর ঘোষ বলল, "তাতেই তো প্রমাণ হল শূলপাণি একজন বৈজ্ঞানিকই ছিল।"

নগেন দারোগা চোখ কটমট করে বলল, "কী করে প্রমাণ হল ?"

সুধীর ঘোষ সকলের দিকে চেয়ে বলল, "হল কি না ভাইসব ?"

সবাই বলে উঠল, "হ্যাঁ হ্যাঁ, হলই তো।"

নগেন দারোগা মাথা নেড়ে বলল, "ডিসগাস্টিং।"

(ক্রমশ)

ছবি : দেবাশিস দেব

কুইজ

রক্তের লোহিত কণিকাকে আক্রমণ করে প্লাজমোডিয়াম ফ্যালসিপেরাম

ম্যালিগন্যান্ট ম্যালেরিয়ার জীবাণু প্লাজমোডিয়াম ফ্যালসিপেরাম প্রথমে বাসা বাঁধে লিভার-এ। সেখান থেকে তারা আক্রমণ করে রক্তের লোহিত কণিকাকে।

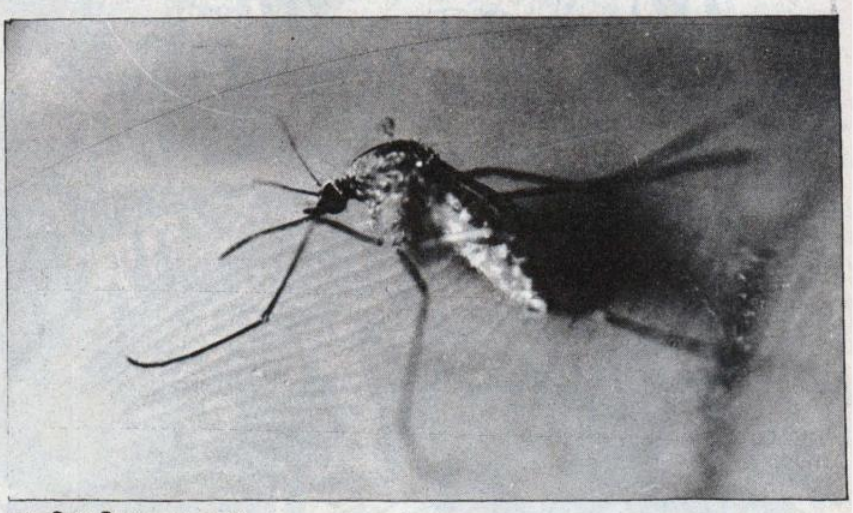

ম্যালেরিয়ার জীবাণু বহন করে মশা

প্লাজমোডিয়াম ফ্যালসিপেরাম! গত কয়েকদিন ধরে এই শব্দ দু'টি শাসন করছে কলকাতা শহর। বর্ণপরিচয় দ্বিতীয় ভাগ শেষ হয়নি, এমন ছোট-ছোট ছেলেমেয়েরাও এখন জানে প্লাজমোডিয়াম ফ্যালসিপেরাম কথাটির মানে। ম্যালিগন্যান্ট ম্যালেরিয়ার জীবাণু এই প্লাজমোডিয়াম ফ্যালসিপেরামের আক্রমণ ইতিমধ্যেই কলকাতা ও তার আশপাশে ছড়িয়ে পড়েছে। বিভিন্ন হাসপাতালে ও নার্সিংহোমে অসুস্থ হয়ে ভর্তি হয়েছেন অনেকে। সবচেয়ে ভয়ের কথা, শোনা যাচ্ছে যে, ম্যালেরিয়া নতুন করে ফিরে আসার কারণ নাকি প্লাজমোডিয়াম জীবাণুর দেহে গড়ে ওঠা একধরনের কুইনাইন-প্রতিরোধক ব্যবস্থা, যার ফলে কোনও-কোনও ক্ষেত্রে কুইনাইন দেওয়া সত্ত্বেও সেরে উঠছে না ম্যালিগন্যান্ট ম্যালেরিয়া রুগি। অথচ চিকিৎসাবিজ্ঞান এখনও কুইনাইন ছাড়া আর কোনও ম্যালেরিয়ার প্রতিষেধক আবিষ্কার করে উঠতে পারেনি। ডাক্তার ও চিকিৎসাবিজ্ঞানীরা দাবি করছেন, যদি কোনও রুগি সঠিক মাত্রায় ক্লোরোকুইন ট্যাবলেট না খান, তবে প্লাজমোডিয়াম জীবাণুর দেহে গড়ে উঠতে পারে কুইনাইন-প্রতিরোধক ব্যবস্থা।

'ক্যালকাটা স্কুল অব ট্রপিক্যাল মেডিসিন'-এর 'প্রোটোজুলজি' বিভাগের প্রধান অধ্যাপক অমিতাভ নন্দী জানিয়েছেন, ক্লোরোকুইন ট্যাবলেটের একটি কোর্সে প্রথমবারে একসঙ্গে চারটি ট্যাবলেট, তার ছ' ঘণ্টা পরে দু'টি ট্যাবলেট, তার ২৪ ঘণ্টা পরে আরও দু'টি ট্যাবলেট এবং শেষ ডোজ হিসেবে ৪৮ ঘণ্টা পরে আরও দু'টি ট্যাবলেট খাওয়া উচিত। কোর্স শুরু করে অসমাপ্ত অবস্থায় থামিয়ে দেওয়ার অর্থই হল প্রকারান্তরে ম্যালেরিয়ার জীবাণুকে শক্তিশালী করা।

আমরা অনেকেই জানি, ম্যালেরিয়ার জীবাণু আমাদের শরীরে প্রবেশ করে 'স্পোরোজাইট' রূপে, স্ত্রী অ্যানোফিলিস মশার রক্তশোষক নালিকার মধ্যে দিয়ে। কিন্তু এই স্পোরোজাইটের জীবনচক্রটি আমাদের অনেকেরই জানা নেই। আমাদের শরীরে প্রবেশ করার আধ ঘণ্টার মধ্যে প্লাজমোডিয়ামের স্পোরোজাইটগুলি জমা হয় আমাদের 'লিভার'-এ। সেখানে অত্যন্ত দ্রুত এই স্পোরোজাইটগুলি রূপান্তরিত হয় পূর্ণাঙ্গ 'ক্রিপ্টোজাইট'-এ। এই ক্রিপ্টোজাইট থেকে তৈরি হয় অসংখ্য 'ক্রিপ্টোমেরোজাইট'। আক্রান্ত লিভার-কোষ থেকে এই ক্রিপ্টোমেরোজাইটগুলি এর পর ছড়িয়ে পড়ে রক্তে। রক্তের লোহিত কণিকা বা 'এরিথ্রোসাইট'-কে আক্রমণ করে এরা। লোহিত কণিকার ভেতরে এই ক্রিপ্টোমেরোজাইটগুলি রূপান্তরিত হয় 'ট্রোফোজাইট'-এ। ট্রোফোজাইট আবার বিভাজিত হয় 'মেরোজাইট', 'সিজোজাইট' আর 'গ্যামেটোসাইট'-এ। এই গ্যামেটোসাইটগুলি বিভাজনক্ষম—আক্রান্ত মানুষের শরীরে মশা কামড়ালে মশার মাধ্যমে এরা ছড়িয়ে পড়ে অন্য মানুষের শরীরে, সেখানেও তখন বংশবিস্তার করে এগুলি। রক্তের লোহিত কণিকায় প্লাজমোডিয়াম ফ্যালসিপেরামের আক্রমণ ঘটলে শরীরের তাপমাত্রা অস্বাভাবিকভাবে বেড়ে যায়, তার সঙ্গে আসে কাঁপুনি। লোহিত কণিকার 'হিমোগ্লোবিন'-কে 'হিম' রঞ্জক আর 'গ্লোবিন' প্রোটিনে বিশ্লিষ্ট করে দেয় প্লাজমোডিয়াম ফ্যালসিপেরাম, এবং গঠন করে 'হিমোজইন' রঞ্জক। ক্লোরোকুইন এই হিমোজইন গঠনে বাধা দেয়। এদিকে প্লাজমোডিয়াম হিমোজইন মাধ্যম ছাড়া বংশবিস্তার করতে পারে না বলে লোহিত কণিকায় হিমোজইন তৈরি বন্ধ হলে এরা মারা পড়ে। এভাবেই ক্লোরোকুইন প্রতিরোধ করে ম্যালেরিয়া। কিন্তু সঠিক মাত্রার চেয়ে কম পরিমাণ ক্লোরোকুইন খেলে হিমোজইন তৈরি বন্ধ তো হয়ই না, বরং প্লাজমোডিয়াম সেই ক্লোরোকুইন আত্মস্থ করে গড়ে তোলে পালটা প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা। এই ব্যবস্থা একবার গড়ে উঠলে তখন আর ক্লোরোকুইন কোনও কাজে আসে না এবং এভাবেই বেড়ে যায় বিপদ।

প্রশ্ন

(১) ঋত্বিক ঘটক পরিচালিত প্রথম ছবির নাম কী ?

চিরদীপ গুহ, জলপাইগুড়ি জিলা বিদ্যালয়, জলপাইগুড়ি ।

(২) পিস্তল আবিষ্কার করেনকে ?

অনন্য বর্মন, জেনকিন্স স্কুল, কোচবিহার ।

(৩) 'কাহাকে উপন্যাসটি লিখেছেন কোন মহিলা উপন্যাসিক ?

শালবনী ঘোষ,কৃষ্ণনগর, নদীয়া ।

(৪) সম্প্রতি একটি বাংলা ছবিতে বিপ্লব চট্টোপাধ্যায় একক অভিনয় করেছেন । ছবিটির নাম কী ?

দীপেনকুমার ঘোষ,জুজারসাহা, হাওড়া ।

(৫) বোম্বাইয়ের চলচ্চিত্র জগতের একসময়ের সবচেয়ে জনপ্রিয় অভিনেত্রী ছিলেন ফতিমা এ. রশিদা । আমরা তাঁকে কী নামে চিনি ?

অম্লান চক্রবর্তী,মাথাভাঙা, কোচবিহার ।

(৬) 'ইন্ডিয়ান ওয়র অব ইন্ডিপেন্ডেন্স' বইটি কে লিখেছেন ?

অর্ণব দত্ত ও অয়ন দে, জেনকিন্স স্কুল, কোচবিহার ।

(৭) 'টিনের তলোয়ার' নামে পি.এল.টি-র একটি নাটক খুব জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিল । নাটকটি পরিচালনা করেছিলেন কে ?

শ্রুতর্বা মুখোপাধ্যায়, সুইনহো লেন, কলকাতা ।

(৮) নেতাজি ইনডোর

ইনি লিখেছেন 'কাহাকে' উপন্যাসটি

স্টেডিয়াম তৈরি হওয়ার পর সেখানে প্রথম কোন আন্তর্জাতিক টুর্নামেন্ট অনুষ্ঠিত হয় ?

রথীন্দ্রনাথ দে, কোন্নগর, হুগলি ।

(৯) কোন ক্রিকেটারের আছে

ইনি পরিচালনা করেছেন 'টিনের তলোয়ার'

একটি টেস্ট ম্যাচে সবচেয়ে বেশি বল করার নজির ?

শরদিন্দু দত্ত, দেবীপুর, হাওড়া ।

(১০) পেরু-র মুদ্রার নাম কী ?

স্বরূপ মণ্ডল, প্রগতি পল্লী, কলকাতা ।

(১১) ভারতের কোন জায়গা 'সিলিকন ভ্যালি অব ইন্ডিয়া' নামে পরিচিত ?

নির্মলেন্দু চক্রবর্তী, আশ্রম রোড, কোচবিহার ।

(১২) কে লিখেছিলেন 'দ্য হার্ট অব ইন্ডিয়া' বইটি ?

জয়ত্রী ভৌমিক, আলিপুরদুয়ার, জলপাইগুড়ি ।

(১৩) ক্রিকেট ও ফুটবলের পরিভাষায় একটি শব্দ দু'টি ভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হয় । শব্দটি কী ?

দিগন্ত রথ, আন্ধেরি, বোম্বাই ।

(১৪) বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের শেষ উপন্যাস কোনটি ?

অপরূপা রায়, কালিয়াগঞ্জ, উত্তর দিনাজপুর ।

(১৫) ভারতীয় ক্রিকেটের 'বায়রন' বলা হয় কোন ক্রিকেটারকে ?

শুভঙ্কর দেবনাথ, শ্রীরামপুর, হুগলি ।

(১৬) আমেরিকার রাষ্ট্রপ্রধান হিসেবে কার্যভার নেওয়ার সময় শপথবাক্য পাঠ করার শেষে একটি বিশেষ বাক্য উচ্চারণ করতে হয় । সেটি কী ?

অরিজিৎ সাউ, গোপ লেন, কলকাতা ।

(উত্তর আগামী সংখ্যায়)

গত সংখ্যার উত্তর

(১) ইভান পেড্রোসো ।
(২) ৪ ফেব্রুয়ারি ।
(৩) ম্যাক্সিম তারাসভ ।
(৪) মৃণাল সেন ।
(৫) ১৯৭৬ সালে ।
(৬) দক্ষিণ কোরিয়া ও বাহরিন ।
(৭) ডিরাক ও শ্রোডিঙ্গার ।
(৮) চা ।
(৯) হেলসিঙ্কি ।

ইভান পেড্রোসো

(১০) ইন্দ্রসভা ।
(১১) ভিয়েতনামের হ্যানয় শহরে ।
(১২) সি ভি রমন ।
(১৩) জে বি এইচ ওয়াদিয়া ।
(১৪) বিহারের রোহতাস জেলার আমঝোর-এ ।
(১৫) নার্গিস দত্ত ।
(১৬) কালোভি ভ্যারি ।

যা শুনলেই শেখা যায়

১৫৩৮০, ১১৮৫০, ৯৮৩৫ কিঃ হাঃ ৬ - ৬.১৫ সকাল (১৯,২৫,৩১ মিটার) ১১৯২০, ৯৮৬০, ৯৬০৫ কিঃ হাঃ ৭ -৭.৪০ সন্ধ্যা (২৫, ৩১ মিটার)
৯৬০৫, ৯৮৬০, ৭১০৫ কিঃ হাঃ ১০ -১০.৩০ রাত (৩১,৪১ মিটার)

বিবিসি বাংলা বিভাগ BBC WORLD SERVICE

বিনামূল্যে!

একটি ১০০ গ্রামের হনি গোল্ড জার
যার দাম টা. ১৯/৫০ প্রতিটি গ্লুকোজডিন
৫০০ গ্রাম প্যাকের সঙ্গে

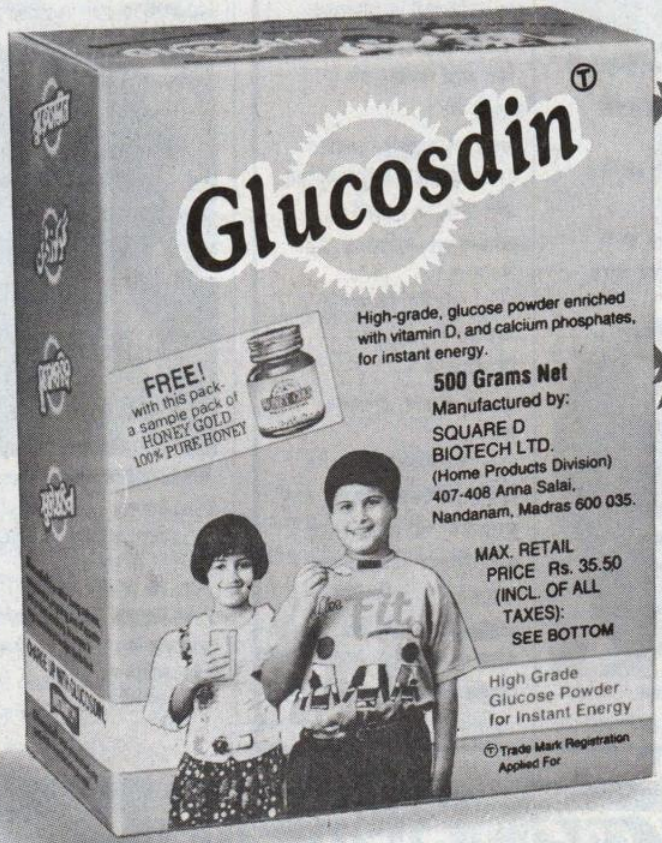

এবার, গ্লুকোজডিন। নুতন গ্লুকোজ-ডি পাউডার আপনাকে দেয় টাকায় আগের চেয়েও অধিক মূল্য।

Glucosdin®

দারুণ মূল্য যার সেই গ্লুকোজডিন-এর জন্য প্রতি প্যাকে 'এনার্জি রিং' দেখে নিন।

কাজেই শিগ্‌গির! কিনে ফেলুন গ্লুকোজডিন, এক্ষুণি!

Trade Mark Registration Applied For

SD/30/95

গ্লুকোজডিন দিয়ে চাঙ্গা হয়ে উঠুন, নিমেষে!

A Quality Product from Square D Biotech Ltd. (Home Products Division).

চিকিৎসার বই

শরীরের হাজার রোগ
শৌর্যেন্দ্রনাথ সরকার
ডেল্টা ফার্মা
বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট
কলকাতা-৭৩
দাম : ৬৫ টাকা

চিকিৎসাবিজ্ঞান বিষয়ে শৌর্যেন্দ্রনাথ সরকারের 'শরীরের হাজার রোগ' বইটিতে মোট ৪১টি রোগের সম্পর্কে লেখা হয়েছে। লেখক বিভিন্ন রোগ

সম্পর্কে বিশিষ্ট চিকিৎসকদের সঙ্গে কথা বলে তাঁদের মতামত ও পরামর্শগুলি বইটির মধ্যে সংযোজিত করেছেন। তা যেমন মূল্যবান তেমনই গুরুত্বপূর্ণ। এ-ধরনের বই হাতের কাছে থাকলে আমরা বিভিন্ন রোগ সম্পর্কে একটা ধারণা পেতে পারি এবং রোগ নিরাময় সম্পর্কেও একটা পথেরও হদিস পেতে পারি। শ্রীসরকার সহজ ভাষায় বিভিন্ন রোগ সম্পর্কে যে তথ্যগুলি দিয়েছেন তার সবই সুখপাঠ্য ও প্রয়োজনীয়।

জয়ন্ত সুকুল

রহস্যকাহিনী

বনস্পতি কথা কয়
অরুণ কুমার দত্ত
১৮০০ প্রকাশন, কলকাতা-৯
দাম ২০ টাকা

ভাবতে ভাল লাগে সত্যিই যদি গাছের সঙ্গে মানুষ কথা বলতে পারত, কী উপকারই না হত ! অরুণকুমার দত্ত তাঁর এই বইটিতে একটি গাছকে যেভাবে কথা বলিয়েছেন বিজ্ঞানের সাহায্যে, তা প্রায় বিশ্বাস করবারই মতো ; সেদিক থেকে বিজ্ঞানাশ্রিত এই রহস্যোপন্যাস চমকপ্রদ লেখা। বাতাবি লেবুর আমদানি বাটাভিয়া থেকে কিংবা মুসাম্বি এসেছে মোজাম্বিক থেকে-এ ও যেন নতুন জানা। মুসান্ডা সত্যিই ফিলিপিন্সের কি না তা নিয়ে গবেষণার অবকাশ থাকতে পারে, তবে লেখার গুণে, পাঠক সে-ব্যাপারে সংশয়ান্বিত নাও হতে পারেন। গাছের চিন্তাশক্তির ব্যাপারে যেসব উদাহরণ দিয়েছেন লেখক, তা সত্যিই চিত্তাকর্ষক। পরিশেষে রহস্যোপন্যাসের জাল পাঠককে বেশ টেনে নিয়ে গেছে পরিণতির দিকে। আর্সেনিক দিয়ে কথা-বলিয়ে বটগাছটিকে মারার বিষয়টিও পাঠকচিত্তকে আহত করে।

বিজ্ঞানের পটভূমিতে লেখা এই রহস্যকাহিনী হৃদয়গ্রাহী।

তরুণ চক্রবর্তী

জীবজগতের কথা

প্রাণ ও প্রকৃতি
মনোজ দত্ত
দে'জ পাবলিশিং
কলকাতা-৭০০ ০৭৩
দাম : ২৫ টাকা

মনোজ দত্তের 'প্রাণ ও প্রকৃতি' এমন একটি বিজ্ঞানের বই, যেখানে জড় ও জীবজগতের নানা বিষয়ে আছে সুন্দর আলোচনা। ছবিগুলি আকর্ষক না হলেও বিষয়গুলি পর্যায়ক্রমে বেশ সহজভাবেই বিশ্লেষণ করেছেন। চেতনা ও প্রাণ আছে এমন পদার্থের পাশাপাশি অচেতন জড় পদার্থের ব্যবধানটুকুও জানাতে ভোলেননি ! কেমন করে হাত ছোঁয়ালে লজ্জাবতী লতা নুয়ে পড়ে

লজ্জায়, শ্যাওলা কীভাবে খাদ্য গ্রহণ করে, কীভাবে পরভোজী প্রাণী 'ইউগ্লেনা' নিজের খাদ্য নিজেই তৈরি করে, এমন অনেক উদাহরণ আছে। আবার ব্যাঙের ছাতা মৃতজীবী উদ্ভিদ। সে কিন্তু সেই মৃত বা পচনশীল জড় পদার্থে বাসা বেঁধে নিজের খাদ্য গ্রহণ করে। ছত্রাকের নেই সবুজকণা বা ক্লোরোফিল। সুন্দর ছাপা, আকর্ষক প্রচ্ছদ।

শোভন মহাপাত্র

কবিতায় বুদ্ধ-বন্দনা

বুদ্ধ প্রণাম
সঙ্কলন-সম্পাদনা : হেমেন্দুবিকাশ চৌধুরী
বৌদ্ধ ধর্মাঙ্কুর সভা
১, বুদ্ধিস্ট টেম্পল স্ট্রিট
কলকাতা-১২
দাম : ৫০ টাকা

কপিলাবাস্তুর তরুণ রাজপুত্র সিদ্ধার্থ থেকে তথাগত বুদ্ধে উত্তরণ-কাহিনী ছোটরাও জানে। অহিংসা-মৈত্রী-করুণার তিনি ভাবরূপ। তাঁর আদর্শ ক্রমবলয়িত হয়ে সারা বিশ্বে ব্যাপ্ত। সংস্কৃত-পালি-প্রাকৃত-চর্যাপদ থেকে রবীন্দ্রনাথ ছুঁয়ে সাম্প্রতিক কাল অবধি সাহিত্যে বুদ্ধপ্রসঙ্গ বিরল নয়। বুদ্ধকথা বিদেশের নানা ভাষায় দেখা যায়। তবু হেমেন্দুবিকাশ চৌধুরীর সম্পাদনায় প্রায় ২০০ জন কবির কবিতা নিয়ে 'বুদ্ধ প্রণাম' একটি উল্লেখযোগ্য সঙ্কলন। রবীন্দ্রনাথ-বিবেকানন্দ থেকে ক্রম ধারাবাহিকতায় অরুণ মিত্র-শঙ্খ ঘোষ-অলোকরঞ্জন-শক্তি-সুনীল ছুঁয়ে সাম্প্রতিক কালের তরুণতম কবির লেখায় সঙ্কলনটি সমৃদ্ধ। আনন্দের কথা, বাংলাদেশের বেশ কয়েকজন কবির কবিতাও সঙ্কলিত হয়েছে। এ-জাতীয় কোষগ্রন্থে রবীন্দ্র-পূর্ববর্তী কবিদের বুদ্ধ-বিষয়ক কবিতা সংযোজিত হলে আরও প্রামাণ্য হত। যেমন, নবীনচন্দ্র সেনের 'অমিতাভ' কাব্যের কিছু অংশ, গিরিশচন্দ্র ঘোষের 'বুদ্ধচরিত'-এর বিখ্যাত কোনও অংশ বা গান (যথা : 'জুড়াইতে চাই, কোথায় জুড়াই....) ইত্যাদি।

'প্রাককথন' পর্যায়ে সম্পাদকের নিবেদন আরও তথ্যসমৃদ্ধ হলে ভাল লাগত। 'স্বামী বিবেকানন্দ কবি হিসেবে পরিচিত নন'—সম্পাদকের এরকম উক্তি ঠিক নয়।

তবু শ্রম-নিষ্ঠা ও গভীর ভালবাসাযুক্ত প্রায় আড়াইশো পাতার সুন্দর বইটি সকলের প্রিয় হয়ে উঠবে।

শান্তি সিংহ

নানারকম

ধাঁধা

"সাতসকালে তোকে ডেকে পাঠিয়েছি কেন জানিস ?"

বললাম, "ধাঁধা রেডি, তাই।"

ছোট্কা বলল, "মোটেও তা নয়। অফিসের কাজে সাততাড়াতাড়ি বেরোত হবে, সাত ঘাটের জল খাওয়া চাকরি আমাদের, তাই সাতপাঁচ ভেবে সকালেই তোকে ডেকে পাঠালাম। ....কিছু বোধগম্য হল ?"

তার মানে আমি ভুল ভেবেছি এতক্ষণ, ধাঁধা রেডি নয়।

ছোট্কার কথা শুনে আমার মুখ শুকিয়ে যায়। ছোট্কা নিশ্চিত অফিসের কাজে বাইরে যাচ্ছে আজ, আর সেই কথাটাই জানাবে বলে ডেকেছে আমায়। আমি ঠাণ্ডা গলায় জবাব দিলাম, "বুঝেছি, তুমি বেরিয়ে যাচ্ছ এখনই, কবে ফিরবে ঠিক নেই, ধাঁধা পেতে দেরি হবে এবার। এই তো ?"

ছোট্কা হো-হো করে হেসে উঠল আমার জবাব শুনে। হাসির রেশ টেনেই বলল, "সতুবাবুর আর উন্নতি হল না। তবে কিনা, বোকাদের সাতখুন মাপ। এতক্ষণ ধরে যে এতভাবে বোঝাতে চাইছি, 'সাত' শব্দটার সাতসতেরো ব্যঞ্জনা আর ব্যবহার, তা কি ঢুকল সতুবাবুর মগজে ? ঢুকল না। তাই সরাসরি ধাঁধাটাই বলে ফেলি। সাতের ধাঁধা এবার শিখে নাও।"

অতিশয় লজ্জিত আমি মুখ নিচু করে লিখতে থাকি।

প্রথম ধাঁধা :সাতকড়িবাবু সাতটা খামে সাত ভাগে ভরে রেখেছেন একশোটা টাকা। এমনই হিসেবী সেই সাতটা ভাগ যে, এক থেকে একশো পর্যন্ত যত টাকাই তোমার দরকার হোক না কেন, সাতকড়িবাবু স্রেফ খাম ধরে-ধরেই সেই টাকা ধরিয়ে দিতে পারবেন তোমার হাতে। নতুন করে খুলতে হবে না খাম, গুনতে হবে না টাকা। বলতে পারো, সাতকড়িবাবু কীভাবে সাতটা খামে টাকা রেখেছিলেন ? সাতটা ভাগ কী ছিল ?

দ্বিতীয় ধাঁধা : 'সাতটি তারার তিমির'— এ-যুগের এক বিখ্যাত কবির লেখা বই। কার কাব্যগ্রন্থ ?

তৃতীয় ধাঁধা : জট ছাড়াও, আলাদা করে ছয় তল ও এক তালের নামও বলো—

পাতাসলপ্ত

গতবারের উত্তর : (১) প্রথম দানে, দ্বিতীয় গুচ্ছের সাত কাঠির সঙ্গে যোগ হবে প্রথম গুচ্ছ থেকে তোলা ৭টি কাঠি। দ্বিতীয় দানে, তৃতীয় গুচ্ছের ছয় কাঠির সঙ্গে যোগ হবে দ্বিতীয় গুচ্ছ থেকে তোলা ৬টি কাঠি। তৃতীয় দানে, প্রথম গুচ্ছের চার কাঠির সঙ্গে যোগ হবে তৃতীয় গুচ্ছের থেকে তোলা ৪টি কাঠি। প্রত্যেক ভাগে এখন ৮টি করে কাঠি। (২) টুথপেস্ট। (৩) বুড়ো আংলা। অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

সত্যসন্ধ

ভাবতে ভাবতে

টেলিফোন ব্যবস্থার ফলে পৃথিবীর একপ্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তের মানুষের সঙ্গে কথা বলা সম্ভব হয়েছে। এই পুরনো টেলিফোনকে কেন্দ্র করে এখন তৈরি হয়েছে কত নতুন-নতুন টেলিফোন ব্যবস্থা। এখন

আমাদের কলকাতাতেই এসে গেছে 'মোবাইল ফোন'। টেলিফোন নিয়ে আমাদের এবারের ভাবতে ভাবতে। প্রশ্নগুলি সবই ভারতের টেলিফোন ব্যবস্থা নিয়ে।

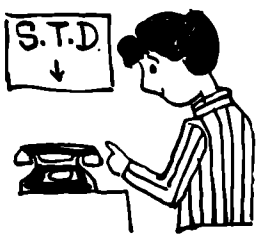

১ ॥ ভারতের প্রথম টেলিফোন এক্সচেঞ্জ কোথায় কবে তৈরি হয় ?

২ ॥ প্রথম রেলওয়ে টেলিফোন চালু হয় কবে ?

৩ ॥ 'অটোমেটিক টেলিফোন এক্সচেঞ্জ' চালু হয় কোথায় ?

৪ ॥ প্রথম এস টি ডি চালু হয় কবে, কোথায় ?

উত্তর : (১) ১৮৮১ সালে কলকাতায়। (২) ১৮৭৯ সালে। (৩) সিমলায়। (৪) ১৯৬০ সালের ২৬ নভেম্বর লখনউ এবং কানপুরের মধ্যে।

বর্ণপ্রিয়

মজার খেলা

দারুণ মজার, আবার একই সঙ্গে অত্যন্ত সহজ একটা মজার খেলা শেখা যাক এবার। খুব ছোট্ট যারা, তাদের পক্ষে এই খেলাটা যাকে বলে একেবারে দুর্দান্ত।

খেলাটা একা-একা খেললেও মজা পাবে, দল বেঁধে খেললে তো মজা পাবেই। খেলাটা কী,শোনো মন দিয়ে।

এ-খেলাটা যে খেলবে, তার কাজ হবে এক থেকে পরপর সংখ্যাগুলো উচ্চারণ করে যাওয়া। কোনও ঊর্ধ্বসীমা নেই, যে যতদূর পারবে এবং ঠিকঠাক বলে যেতে পারবে সে-ই জিতবে। ভুল বললে বা

হোঁচট খেলে সঙ্গে-সঙ্গে 'আউট'।

তবে কিনা, শুধুই এক থেকে শুরু করে পরপর সংখ্যাগুলো উচ্চারণ করা নয়, একটা শর্ত রয়েছে। শর্তটাও বেশ মজাদার। আর সেই মজাটা হল এইরকম—

যখনই পাঁচ কিংবা পাঁচের কোনও গুণিতক সংখ্যা আসবে, তখন বলতে হবে 'হাঁস'। আবার যখনই সাত অথবা সাতের গুণিতক সংখ্যা আসবে,বলতে হবে 'ফাঁস'। আর যখন পাঁচ আর সাতের গুণফল আসবে, তখন বলতে হবে 'হাঁসফাঁস' (যেমন ৩৫, ৭০ কিংবা ১০৫)।

অর্থাৎ সাবধান হতে হবে, ৫, ১০, ১৫, ২০, ২৫ ইত্যাদি পাঁচের গুণিতক সংখ্যার বেলা। আর সতর্ক হতে হবে ৭, ১৪, ২১, ২৮ ইত্যাদি সংখ্যার বেলা। আবার ৩৫, ৭০, ১০৫ জাতীয় সংখ্যার ক্ষেত্রেও খুব ভেবেচিন্তে 'হাঁসফাঁস' উচ্চারণ করতে হবে। যে পারবে না, সে হেরো। তাকে নিয়েই মজা। তার কথা ভেবেই এই মজার খেলা।

মজারু

P&G
প্রো-ভিটামিন বি 5
যুক্ত
ট্রীটমেন্ট
শ্যাম্পু
PANTENE
প্যান্টিন
প্রো-ভি
চুল এত সুস্থ যে ঝলমল করে।
Trikaya Grey P&G.1.95 BEN

ANANDAMELA 6 DECEMBER 1995 REGD. NO.
WB/CC/264 MH-BY-SOUTH-683 TN/MS(C)731 RS. 15.00

এদের মতো আপনিও কি উজালা ব্যবহার করেন?

UJALA Supreme
From Jyothy Laboratories

নিশ্চয়ই জানেন উজালা নীল নয় !
তাই নীল ভেবে জলে বেশী-বেশী ঢেলে দেবেন না । এক লিটার জলে শুধু চার ফোঁটাই যথেষ্ট (আধ-বালতি জলে, দশ থেকে বারো ফোঁটা)। কারণ, উজালা একটা বৈজ্ঞানিক ফর্মূলার উপাদান, যা একটু দিলেই সদ্য ধোয়া জামাকাপড়ে আনে এক নতুন চমক্ । তাই তো উজালা সচেতন গৃহিনীদের একমাত্র পছন্দ ।

নিজেই পরখ করে দেখুন।
উজালায় সত্যিই একটা ব্যাপার আছে।